তাত্ত্বিক প্রবচন

(১) সারকথা

অদ্যাবধি আমি যা কিছু শুনেছি, পড়েছি এবং বুঝেছি এর সার জানাচ্ছি। সেই সারও কোনও নতুন কথা নয়, তা সকলের অভিজ্ঞতালব্ধ কথা। মানুষের স্বভাব হলো যে সে সর্বদা নতুন নতুন কথা শুনতে চায়। প্রকৃতপক্ষে যা চিরকাল থাকে সেইটিই হলো নতুন কথা। আপনারা সেই কথার দিকে দৃষ্টি দিন। তা খুবই লাভজনক এবং সহজ সরল কথা। তাকে ধারণ করুন। যদি দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নেন তাহলে এখনই মুক্তি পেয়ে যাবেন। এখনই যদি সেই অভিজ্ঞতা নাও হয়, ভবিষ্যতে তা হবেই, এটি নিশ্চিত। বিদ্যা সময় হলে পাকে—'**বিদ্যা কালেন পচ্যতে**।' অতএব সেই কথাটি আপনারা আজকেই মেনে নিন। যেমন, কৃষিতে কেউ বীজ বোনার পর তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে যে তার ক্ষেতের কাজ হয়ে গিয়েছে। সেইরকম আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি যে ঐ কথা আপনারা দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নিলেই কল্যাণ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যাদের উৎকণ্ঠা বেশি তাদের তত্ত্বানুভূতি এখনই হয়ে যাবে, আর যাদের তা কম তাদের অভিজ্ঞতা হতে দেরি হবে।

এই-যে বিশ্বসংসার—এটি প্রতিমুহূর্তে বিনাশের দিকে যাচ্ছে, এইটি সার কথা, সাধারণ কথা বলে মনে হয়, কিন্তু এটি খুবই মার্মিক কথা। এই-যে সংসার—যাকে দেখা যায়, শোনা যায়, বোঝা যায় তা একমুর্হূতও স্থিত নয়, নিরন্তর চলমান। যত জীবিত প্রাণী আছে, সবই মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে। সমগ্র বিশ্বসংসার প্রলয়ের দিকে যাচ্ছে। সবকিছুই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যা দৃশ্যমান তা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। দর্শন অদর্শনে চলে যাচ্ছে, ভাব অ-ভাবে পরিণত হচ্ছে। এটি সারকথা, এটি সকলের অভিজ্ঞতার কথা। এতে কারও বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। এখন 'অস্তি' রূপে যা কিছু দেখা যায় সেগুলি সব 'নাস্তি'-র দিকে যায়। দেহ, ধন, জমি, বাড়ি, আত্মীয়, .মান, সম্মান, প্রতিষ্ঠা, পদ, অধিকার, যোগ্যতা সবকিছুই 'নাস্তি' অর্থাৎ অ-

ভাবের দিকে যাচ্ছে। এটি মন দিয়ে শুনুন, বুঝুন এবং মেনে নিন, একেবারেই সত্য কথা। সংসারকে 'অস্তি' অর্থাৎ তা থাকবে এটি মনে করাই ভুল।

স্মৃতি (স্মরণ) দু'রকমের হয়— (১) ক্রিয়াত্মক, যেমন, নাম-জপ প্রভৃতি করা, এবং (২) জ্ঞানাত্মক। ক্রিয়াত্মক স্মৃতি সবসময় থাকে না, কিন্তু জ্ঞানাত্মক স্মৃতি সবসময় থাকে। একবার জেনে নিলে তা থেকেই যায়। জেনে নেবার পর আর বিস্মৃতি, ভ্রান্তি হয় না। ক্রিয়াত্মক-স্মৃতিতে যখন ক্রিয়া হয় না, তখন ভুল হয়। জ্ঞানাত্মক-স্মৃতির ভ্রান্তি ভিন্ন প্রকারের। যেমন, একজন ব্রাহ্মণ লোক নিজেকে ব্রাহ্মণ মনে করে। সে সারাদিনে একবারও মনে করে না যে সে ব্রাহ্মণ। প্রয়োজন না হলে সারা মাসেও মনে করে না, কিন্তু স্মরণ না করলেও ভেতরে ভেতরে 'আমি ব্রাহ্মণ' এটি সবসময় মনে থাকে। তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে সে নিজেকে ব্রাহ্মণই বলবে। এই স্মরণকে ভুল তখনই মনে করা হবে যখন সে নিজেকে ভুল করে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় অথবা হরিজন বলে মনে করবে। তেমনই সংসারকে যদি প্রকৃত বলে মনে করা হয় তাহলে তা ভুল । সেইজন্য এই কথাটি ভাল করে জেনে নিন যে সংসার নিরন্তর বিনাশের দিকেই যাচ্ছে। তারপর এই কথা মনে থাক আর না থাক। স্বীকৃত কথাকে আর মনে করতে হয় না। স্বীকৃত কথার জ্ঞানাত্মক স্মৃতি থাকে। মা-বোনেরা প্রত্যেকে জানেন যে 'আমি স্ত্রী'। তাই তা মনে করার দরকার হয় না। ভায়েরা প্রত্যেকে জানেন যে 'আমি পুরুষ'। তাই তা মনে করবার দরকার হয় না। তেমনি সাধুকেও মুখস্থ করতে হয় না যে তিনি সাধু, এটি মনে ধরে রাখতে মালা জপতেও হয় না। মেনে নিলেই হয়ে গেল। বিবাহ হয়ে যাবার পর মানুষকে ভাবতে হয় না যে বিবাহ হয়েছে, না হয়নি। অনুরূপভাবে আপনারা আজই বিশেষরূপে চিন্তা করুন যে সংসার প্রতিমুহূর্তে চলে যাচ্ছে। এটি এখন যে রূপে আছে সেই রূপে সবসময় থাকতেই পারে না।

দ্বিতীয় কথা, যে সংসার 'নাস্তি' তাকে 'অস্তি-র' দ্বারাই দেখা যাচ্ছে। যেমন, একজন লোক বসে আছে, তার সামনে দিয়ে কুড়ি পঁচিশ জন লোক

চলে গেল। প্রশ্ন করলে সে বলবে এখান দিয়ে কুড়ি পঁচিশটি লোক চলে গেল। সেই লোকটিও যদি তাঁদের সঙ্গে চলে যেত তাহলে এতগুলি লোক যে সেখান দিয়ে গিয়েছে এই খবর কে দিত? কিন্তু সেই লোকটি যায়নি, সেখানেই ছিল। তাই অতগুলি লোকের যাবার কথা সে বলতে পেরেছে। না থাকলে চলে যাওয়ার খবর কে দিতে পারে? সেই রকম, পরমাত্মা থাকেন আর সংসার চলে যায়। আপনারা যদি এই কথা মেনে নেন যে সংসার চলে যাচ্ছে, তাহলে আপনাদের স্থিতি স্বাভাবিকভাবেই সর্বদা বিদ্যমান পরমাত্মায় থেকেই যাবে, কিছু করতে হবে না। সংসারকে স্থিতিশীল মনে করলেই পরমাত্মাকে ভুলে যাবেন। সংসারকে প্রতিমুহূর্তে চলে যাচ্ছে মনে করলেই পরমাত্মাকে স্মরণ না করলেও আপনাদের স্থিতি প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাতেই থাকে।

সংসারের অবসান হচ্ছে—এটি খুবই শ্রেষ্ঠ এবং মূল্যবান কথা, সিদ্ধান্তের কথা, বেদ এবং বেদান্তের কথা, মহাপুরুষদের কথা। পরমাত্মা থাকেন এবং সংসার চলে যায়। সেই পরমাত্মা অস্তিরূপে সর্বত্র পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—যুগের এই পরিবর্তন হয়, কিন্তু পরমাত্মার কখনও পরিবর্তন হয় না। তিনি চিরকাল যেমনকার তেমনই থাকেন। দুটি বিশেষ কথা রয়েছে—সংসার নেই, পরমাত্মা আছেন ; সংসারের অবসান হবে, পরমাত্মা থাকবেন। যদি আপনারা এই কথাগুলি মেনে নেন তাহলে জানবেন যে খুব বড় কাজ করেছেন, আপনাদের জীবন সফল হয়ে গিয়েছে। তারপর তত্ত্বজ্ঞান, ভগবৎ প্রাপ্তি, মুক্তি প্রভৃতি সবকিছু এর থেকেই হয়ে যাবে।

সংসার নিরন্তর চলে যাচ্ছে, এরকম দেখতে দেখতে ক্রমশ এমন এক স্থিতি আসবে যে নিজের কাছে সংসার 'নাস্তি' রূপে ভাসিত হবে। একমাত্র পরমাত্মাই আছেন, সংসার নেই—এই অনুভূতি জাগবে। সন্তরা বলেছেন— **'য়হ নহি য়হ নহি য়হ নহি হোঈ, তাকে পরে অগম হৈ সোঈ'**। এইটিই সারকথা। এটিকে হৃদয়ে বসিয়ে নিন। সকলের অনুভূত কথা হলো এই যে আগের অবস্থা, পরিস্থিতি, ঘটনা, ক্রিয়া, পদার্থ, সাথী

প্রভৃতি এখন কোথায়? সেগুলি যেমন চলে গিয়েছে তেমনি এখনকার অবস্থা, পরিস্থিতি, পদার্থ প্রভৃতিও চলে যাবে। এগুলি তো নিরন্তর চলে যাচ্ছেই। সংসারের অবসান হবার রীতি তো চিরকাল ধরে চলে আসছে—

কোঈ আজ গয়া কোঈ কাল গয়া, কোঈ জাবনহার তৈয়ার খড়া।
নহীঁ কায়ম কোঈ মুকাম য়হাঁ চিরকালসে য়হী বিরাজ রহী।।

শুরু থেকেই এই রীতি চলে আসছে যে সংসার একমুহূর্তও থেমে থাকে না। এই অভিজ্ঞতা সকলের। এই অভিজ্ঞতাকে সম্মান করা হয় না, এইটিই হলো ভ্রান্তি। এইজন্যই বারবার জন্ম-মৃত্যু হয়। অতএব আজই দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নিন যে সমগ্র সংসারের প্রতিমুহূর্তে অবসান হচ্ছে। এইটি সারকথা।

(২) মুক্তি সহজ

একটি খুবই ভাল, শ্রেষ্ঠ কথা। এই দিকে আপনারা মন দিলে বিশেষ লাভ হবে। কথা হলো এই যে আমরা ভগবৎ প্রাপ্তি, জীবন্মুক্তি, তত্ত্বজ্ঞান, পরমপ্রেম, কল্যাণ, উদ্ধার প্রভৃতি যা কিছুই (উচ্চ থেকে উচ্চতর) চাই, তার প্রাপ্তি স্বতঃসিদ্ধ। এটি খুবই মূল্যবান কথা। এতে আপনারা মেনে নিন। এটি বোঝাতে আমি নিজেকে অসমর্থ মনে করি। লোকেদের ধারণা হলো, মেনে নিলে কী হয়? শুধু মেনে নিলে কী লাভ? তাই আমার কথা শুনে ফেলে দেয়।

এবারে আপনারা মন দিন। গীতায় ভগবান বলেছেন—'**প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যানাদী উভাবপি।।**' (১৩/১৯) 'প্রকৃতি এবং পুরুষ দুটিকেই তুমি অনাদি বলে জানবে।' এবং '**ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।**' (১৩/২) 'হে অর্জুন! তুমি সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবাত্মা আমাকেই জান।' অভিপ্রায় হলো প্রকৃতি এবং পুরুষ এই দুটিকে ভিন্ন বলে মনে করবেন। আপনারা পুরুষ এবং প্রকৃতি আপনাদের

থেকে ভিন্ন। এর তাৎপর্য হলো আপনারা যা থেকে পৃথক অর্থাৎ মুক্ত হতে চান সেই প্রকৃতি থেকে আপনারা স্বতঃই মুক্ত। কেবল আপনারা নিজেদের ইচ্ছায় প্রকৃতিকে ধরে রেখেছেন, তাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রকৃতিকে ধরে রাখলেই দুঃখ এবং বন্ধন হয়। একে ছেড়ে দিলে আপনারা যেমনকার তেমনই (জীবন্মুক্ত) থেকে যাবেন।

আপনারা চিরকাল থেকে যাবার আর প্রকৃতি নিরন্তর পরিবর্তনশীল। সে স্বাভাবিকভাবেই আপনাদের থেকে পৃথক। প্রকৃতি আপনাদের ধরে রাখেনি, তা সত্ত্বেও আপনারা প্রকৃতিকে ধরে রেখেছেন এবং আমি-আমিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমি-আমিত্বকে স্বীকার করে নেওয়াটাই ভুল। এই-যে ইন্দ্রিয় সমন্বিত শরীর এটি 'আমি' নই, আর এই যে সংসার এটিও 'আমার' নয়। এই কথাটি মেনে নিতে হবে, আর কিছু করতে হবে না। কারণ হলো, এইটিই বাস্তব। আপনারা চিরকাল থাকবেন আর সংসার চিরকাল চলে যাবে—কেবল এই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, আর কিছু করতে হবে না। এই করা-করানো প্রকৃতির (সংসারের) রাজত্বেই রয়েছে। যে মুহূর্তে বুঝতে পারবেন যে আপনারা সংসার থেকে ভিন্ন সেই মুহূর্তেই মুক্তি।

সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ মেনে নেবার বিশেষ কারণ হলো তা থেকে সুখ পাবার ইচ্ছা। এই সুখ পাবার ইচ্ছাই হলো সকল দুঃখ, পাপ, অনর্থ, দুরাচার, অন্যায় প্রভৃতির মূল। যতক্ষণ পর্যন্ত সাংসারিক বস্তুগুলি সংগ্রহ করার এবং সুখ ভোগের ইচ্ছা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যত কথাই শুনুন, পড়ুন, শিখুন এবং এমনকি ত্রিলোকের রাজ্যও পেয়ে যান তবুও দুঃখ দূর হবে না। এটি পাকা কথা। সংগ্রহ এবং সুখভোগের বৃত্তি চেষ্টা করলে দূর হয় না। এখানে চেষ্টার কথাই নেই। আপনারা 'আমি-আমিত্ব'-কে স্বীকৃতি দিয়েছেন। স্বীকৃত কথাকে অস্বীকার করলেই তা দূর হয়, চেষ্টায় হয় না। বিবাহের পর স্ত্রী পুরুষকে তার স্বামী বলে মেনে নেয়, তো এতে (স্বামী মেনে নেওয়ায়) কোন্ চেষ্টা করতে হয়? ব্যাস শুধু মেনে নেওয়া। কারও সঙ্গে সম্বন্ধ জোড়া আর তা ত্যাগ—এতে সকলেই স্বতন্ত্র। বাস্তবে আমাদের সম্বন্ধ কেবল পরমাত্মার সঙ্গেই আছে। ভুল করে আমরা

প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত করেছি। এখন ঐ স্বীকৃত সম্বন্ধকে ভেঙে ফেলতে হবে—শুধু এইটুকুই কাজ। পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ স্বাভাবিক এবং প্রকৃত। আর প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ অস্বাভাবিক এবং সাজানো। অস্বাভাবিক এবং সাজানো সম্বন্ধকে ভেঙে দিতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের সম্বন্ধ না মানলে এটি ভেঙে যাবে। আগে তো নিজেদের বালক মনে করতেন, এখন কি আর তা মনে করেন? যেমন বালক অবস্থাকে আপনারা মেনে নিয়েছিলেন সেইরকম এখন যৌবনাবস্থাকে মেনে নিয়েছেন—'আমি যুবক'? এইভাবেই 'আমি রুগী' 'আমি নীরোগ' প্রভৃতি স্বীকৃতি রয়েছে। বৃদ্ধাবস্থার সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করে নিলেন এবং তারপর মৃত্যুর সঙ্গে। ভেবে দেখুন তো, এই মেনে নেওয়া ছাড়া আপনারা আর কী চেষ্টা করেছেন? যেমন আগে নিজেদের বালক ভেবেছিলেন এখন আর বালক না ভেবে যুবক বলে মেনে নিয়েছেন। তাহলে শুধুই মেনে নেওয়া। কোনও চেষ্টাও নয়, কোনও চিন্তাও নয়। সংসারে এত সহজ কথা আর নেই। কেবল সংসর্গজনিত সুখের ইচ্ছার দরুণ এটি স্বীকার করতে বেগ পেতে হয়। এই সংযর্গের জন্য সুখও এমন হয় যে তার পরিণামে কেবল দুঃখই পাওয়া যায়। সুখের লালসায় ভীষণ অনর্থ হয়ে থাকে। একে হটাবার শক্তি ব্রহ্মারও নেই। টাকা-পয়সা পেলে সুখী হব, বস্তু পেলে সুখী হব—এগুলিই হলো মূল বাধা। আজ পর্যন্ত কেউই এইসব বস্তু থেকে পূর্ণ সুখ লাভ করেনি, পেতে পারে না। বাল্যাবস্থা থেকে সুখপ্রাপ্তির পিছনে দৌড়াচ্ছেন। এখনও পর্যন্ত কতটা সুখ পেয়েছেন, বলুন তো! অর্থও সংগৃহীত হয়েছে, বিষয়ভোগও হয়েছে, কিছুটা মান সম্মানও পাওয়া গিয়েছে—সংসারের এইরকম অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই রয়েছে। কিন্তু বলুন তো এ থেকে আজ পর্যন্ত কি তৃপ্তি হয়েছে? এ থেকে পূর্ণ সুখ কি পাওয়া গিয়েছে? যদি পাওয়া না গিয়ে থাকে তাহলে কেন এর পিছনে ছুটছেন? নুতন করে আর কি দেখবেন? অবশিষ্ট যা তা হলো আরও বেশি দুঃখ পাওয়া। দুঃখ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। এটি কোনও হাল্কা, হাসি তামাশার কথা নয়। সংসর্গজনিত সুখ নিলে পরিণামে দুঃখই হয়। প্রকৃত সুখ-আনন্দ বাইরে

থেকে আসে না, বরং তা আসে ভিতর থেকে। প্রকৃত সুখের শেষ নেই। একবার পেয়ে গেলে আর কখনও তার বিচ্ছেদ হয় না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত বাইরের সুখ নেবেন, তার ইচ্ছা করবেন, তাকে গুরুত্ব দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ভিতরের সুখ পাওয়া যাবে না। সংসর্গ থেকে সুখ প্রাপ্তির ইচ্ছাকে দূর করবার উপায় হলো 'অপরে সুখ কি করে পাবে' তার প্রবল ইচ্ছা। অপরের দুঃখ কি করে দূর হবে তার জন্য ভিতরে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হোক। আমি কিছু করার উপর জোর দিই না, ভাব সৃষ্টির উপর জোর দিই। ভাব থেকে তখনই কাজ হয়ে যায়। ভাব হলে, কর্ম স্বতঃই হয়ে যায়। সমস্ত প্রাণীর সুখের ভাব সৃষ্টি হলে নিজের সুখের লালসা সহজেই দূর হয় আর নিজের সুখের লালসা দূর হলে প্রাপ্ত বস্তু (মুক্তি, প্রেম প্রভৃতি)-র অনুভূতি সহজেই হয়ে যায়।

(৩) প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব

এক পরমাত্মাই সত্য, আর সবকিছু অসত্য। অসত্যের অর্থ হলো যা অবিদ্যমান। যে বস্তু নেই তাকেই অসত্য বলা হয়। যে বস্তু অবিদ্যমান তা অদৃশ্য, কিন্তু সংসারকে তো দেখা যায়। তাহলে সংসার অসত্য কি করে? প্রকৃতপক্ষে অসত্য হয়েও সংসার সত্য-তত্ত্ব পরমাত্মার জন্য সত্য বলে প্রতীত হয়। তাৎপর্য হলো এই যে সংসারের স্বতন্ত্র সত্তা নেই। দর্পণে যেমন মুখ দৃষ্ট হয়, তেমনই সংসারও দৃষ্ট হয়। দর্পণে মুখ দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু সেখানে মুখ নেই। তেমনই সংসার দৃষ্ট হলেও প্রকৃতপক্ষে তা বিদ্যমান নয়। বাস্তবে এক পরমাত্মতত্ত্বের সত্তাই আছে। পরমাত্মা অপরিবর্তনশীল আর প্রকৃতি (সংসার) নিরন্তর পরিবর্তনশীল। যাতে নিরন্তর পরিবর্তনরূপ ক্রিয়া হতে থাকে, তার নাম প্রকৃতি—"**প্রকর্ষেণ করণং প্রকৃতিঃ**" সংসার তথা তার অংশ শরীর নিরন্তর পরিবর্তনশীল। আর পরমাত্মা তথা তার অংশ জীবের কখনও পরিবর্তন হয় না। অপরিবর্তনীয় জীব পরিবর্তনশীল সংসারের আশ্রয় নেয়, সেখান থেকে

সুখ নেয়—এটি ভুল। নিরন্তর পরিবর্তনশীল কি অপরিবর্তনীয়কে প্রসন্ন করতে পারে? কতক্ষণ সে তার সঙ্গী থাকতে পারে? অতএব সংসারকে আপন মনে করা, তার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার ইচ্ছা করা, তার উপর ভরসা করা, তার আশ্রয় নেওয়া—সবই ভুল। এই ভুল আমাদের সংশোধন করতে হবে। এইজন্য গীতায় ভগবান বলেছেন **'মামেকং শরণং ব্রজ'** "একমাত্র আমার শরণাগত হও"। হ্যাঁ, সাংসারিক বস্তুর সদ্ব্যবহার তো কর, কিন্তু সেগুলিকে গুরুত্ব দিও না, সাংসারিক বস্তুর জন্য নিজেকে বড় মনে কর না।

অনেক টাকা-পয়সা হলে মানুষ নিজেকে বড় মনে করে। কিন্তু বাস্তবে সে বড় হয় না, ছোটই হয়ে যায়। মনে করুন, টাকা-পয়সার দরুণ মানুষ বড় হলো, তাহলে (টাকা-পয়সা না থাকায়) সে স্বয়ং ছোট বলে প্রমাণিত হলো। অর্থে দর্পিত মানুষ নিজের নিন্দা ও অপমান করে এবং নিজেকে ছোট করেই নিজের শ্রেষ্ঠত্বে অহঙ্কার করে থাকে। বাস্তবে আপনিই স্বয়ং নিরন্তর অবস্থান করেন আর ধন, মান, সম্মান, প্রশংসা, নীরোগ, পদ, অধিকার প্রভৃতি সব- কিছু যাওয়া-আসা করে। এগুলির দ্বারা আপনারা শ্রেষ্ঠ কি করে হলেন? এগুলির জন্য নিজেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার করা হলো প্রকৃতপক্ষে নিজেদের পতন ঘটানো। এইরকমই নির্ধনতা, নিন্দা, রোগ, প্রভৃতির কারণে নিজেদের ছোট মনে করাও ভুল। যে বস্তু আসে-যায় তার দ্বারা কেউ ছোট-বড় হয় না।

বিনাশশীল পদার্থগুলির উপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে জন্ম-মরণরূপ বন্ধন, দুঃখ, সন্তাপ, জ্বালা প্রভৃতি সব উৎপন্ন হয়। অতএব ভালভাবে চিন্তা করতে হবে যে, আমি (স্বয়ং) তো চিরকাল থাকব আর এই জিনিসগুলি আসবে, যাবে। তাহলে এই বস্তুগুলির আসা-যাওয়ার প্রভাব আমার উপর কি করে পড়তে পারে?

ধন-কে আপনি সৃষ্টি করেন, নাকি ধন আপনাকে সৃষ্টি করে? আপনি ধনের ব্যবহার করেন, নাকি ধন আপনাকে ব্যবহার করে? ধন আপনার অধীন, নাকি আপনি ধনের অধীন? আপনিই ধনের মালিক, ধন আপনার

মালিক নয়। এই কথাটি সর্বদা মনে রাখবেন। আপনি ধনপতি হন, ধনদাস হবেন না।

এইটুকুই কথা। টাকা-পয়সাকে গুরুত্ব দিলে এবং টাকা-পয়সার কারণে মানুষ নিজেকে বড় মনে করলে মানুষ ধনদাস (ধনের গোলাম) হয়ে যায়। এর দ্বারাই সে দুঃখ পায়। নইলে আপনাকে দুঃখ দেবার কে আছে? ধনাদি বস্তু তো আসে-যায়, তা আপনাকে সুখী বা দুঃখী কি করে করতে পারে? তা তো নদীর স্রোতের মতো নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে। যদি আপনার ধনাঢ্য অবস্থা চল্লিশ বছর থাকার হয় এবং তা থেকে এক বছর চলে যায় তাহলে বলুন তো আপনার ধনাঢ্য অবস্থা বাড়ল, না কমল? ধনাঢ্য অবস্থা তো নিরন্তর কমতেই থাকে এবং চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে তা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি যেমনকার তেমনই থেকে যাবেন। যখন টাকা-পয়সা ছিল না আপনি যেমন ছিলেন, যখন টাকা-পয়সা হলো তখনও আপনি তেমনই আছেন আর যখন টাকা-পয়সা থাকবে না তখনও আপনি সেইরকমই থাকবেন। সংসারের সকল বস্তু নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে। যে মানুষের উপর এই প্রবাহমান বস্তুর প্রভাব পড়ে না তিনি মুক্ত হয়ে যান (গীতা ২/১৫)। এইজন্য বিবেকবান পুরুষ বিনাশশীল বস্তুর মধ্যে রমণ করে না—**"ন তেষু রমতে বুধঃ"** (গীতা ৫/২২)। যিনি বস্তুকে অস্থির বলে মনে করেন তিনি বস্তুর দাস হন না। বস্তুসমূহকে নিয়ে যে মানুষ সুখী বা দুঃখী হয় সে নিজের অবস্থান থেকে পতিত হয়, ছোট হয়ে যায়। আসে-যায় এমন বস্তুর প্রভাব না পড়াই প্রকৃত শ্রেষ্ঠতা।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থির বুদ্ধিরসম্মূঢো ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মণি স্থিতঃ।। (গীতা ৫/২০)

"যে পুরুষ প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত করে হর্ষিত হয় না এবং অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত করে উদ্বিগ্ন হয় না, সেই স্থিরবুদ্ধি সংশয়রহিত ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ পরমব্রহ্ম পরমাত্মায় একীভূক্ত হয়ে নিত্য স্থিত হন।"

❀ ❀ ❀

(৪) সংযোগে বিয়োগের দর্শন

সংসারে সংযোগ এবং বিয়োগ দুটি জিনিস আছে। আপনারা এবং আমি মিলিত হলাম, এটি হলো সংযোগ এবং আপনারা ও আমি আলাদা হয়ে গেলাম এটি হলো বিয়োগ। এই যে সংযোগ এবং বিয়োগ দুটি আছে এর মধ্যে বিয়োগ হলো প্রবল। তাৎপর্য হলো সংসর্গ হবে, কি হবে না তার নিশ্চয়তা নেই কিন্তু বিয়োগ অবশ্যই হবে—এটি নিশ্চিত। যার সঙ্গে বিয়োগ হলো তার সঙ্গে আবার সংযোগ হবে, এর কোনও স্থিরতা নেই। কিন্তু যার সঙ্গে সংযোগ হলো তার সঙ্গে বিয়োগ হবে এটি নিশ্চিত। এ থেকে এটি সিদ্ধ হয় যে যা কিছু সংযোগ সবই বিয়োগের দিকে যাচ্ছে। প্রত্যেক সংযোগের বিয়োগ হচ্ছে, এই অভিজ্ঞতা সকলেরই। এখন এর মধ্যে বুদ্ধিমত্তা হলো এই যে যার বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী সেই বিয়োগকে আমরা এখনই, বর্তমানেই যেন মেনে নিই। তাহলে মুক্তি, তত্ত্বজ্ঞান, বোধ নিজে থেকেই হয়ে যাবে। কত সহজ কথা।

শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, 'আমিত্ব'—এই সবগুলিরই একদিন বিয়োগ হয়ে যাবে। আপনারা এই বিয়োগের অনুভূতি বর্তমানেই করে নিন। প্রত্যেকটি সংযোগ বিয়োগে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এইজন্য বাস্তবে বিয়োগই আছে, মোটেই সংযোগ নেই। সংযোগরূপ কাঠ বিয়োগরূপী আগুনে সব- সময় জ্বলছে।

জীবের প্রকৃত সম্বন্ধ পরমাত্মার সঙ্গে, তাকে যোগ বলা হয়। এর কখনও বিয়োগ হয় না। বস্তুত পরমাত্মার সঙ্গে জীবের কখনই বিয়োগ হয়নি। জীব পরমাত্মার প্রতি কেবল বিমুখ হয়ে যায়। সংসারের সঙ্গে মানুষের সংযোগ হয়, যোগ হয় না। সংযোগের তো বিয়োগ হয়, কিন্তু যোগ চিরকাল থাকে। যেমন এখানে আমি দু মাসের জন্য এসেছি। এখন পনের/কুড়ি দিন চলে গিয়েছে, তাহলে আরও দু'মাস কি বাকি আছে? এই দশ/পনের দিন বিযুক্ত হয়ে গিয়েছে, আমরা তা থেকে আলাদা হয়ে

গিয়েছি, হয়ে যাচ্ছি। একদিন সম্পূর্ণ বিয়োগ হয়ে যাবে। এইভাবে বস্তু, পরিস্থিতি, অবস্থা প্রভৃতি আমাদের থেকে বিযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। কোনও নতুন সংযোগ যদি হয় তাহলে সেটিও বিযুক্ত হয়ে যাবে। এতে কি কোনও সন্দেহ আছে? এই বিয়োগকেই যেন আমরা গুরুত্ব দিই, একে সত্য বলে মানি। তখন পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের স্থিতি স্বতঃ হয়ে যাবে। কারণ সততার দ্বারাই সৎ-তত্ত্বের সঙ্গে একাত্মতা হয়। পরমাত্মাতে স্থিতির নাম মুক্তি।

যা অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ যা হওয়া নিশ্চিত সেই বিয়োগকে যদি প্রথমেই স্বীকার করে নিই তাহলে শেষে আর কাঁদতে হবে না—

মন পছিতৈহৈ অবসর বীতে।
অন্তহুঁ তোহিঁ তজৈঁগে পামর! তূ ন তজৈ অব হী তে।।

(বিনয় পত্রিকা ১৯৮)

বর্তমানেই বিয়োগকে স্বীকার করে নেওয়া হলো 'যোগ'—

'তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসঞ্জিতম্।' (গীতা ৬/২৩)

'দুঃখরূপ সংসারের থেকে বিযুক্তির নাম যোগ।' সংযোগে বৈষম্য থাকে। সংযোগ ছাড়া বৈষম্য হয় না। সংযোগকে ত্যাগ করলে বৈষম্য দূর হয় এবং যোগ প্রাপ্ত হয়ে যায়—**'সমত্বং যোগ উচ্চতে'** (গীতা ২/৪৮)। তখন দুঃখ থাকে না, সন্তাপ থাকে না, জ্বালা বা চাঞ্চল্য থাকে না।

যতক্ষণ পর্যন্ত সংযোগ রয়েছে ততক্ষণ প্রীতিপূর্বক থাকুন, অপরের সেবা করুন—**'সবসে হিলমিল চালিয়ে নদী নাও সংযোগ।।'** যতটা সম্ভব সেবা করুন, তার বদলে কোনও কিছুর আশা করবেন না। যাদের থেকে বিযুক্ত হবে তাদের প্রতি আশা রাখা কেন? মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বন্ধু প্রভৃতি যারা আছে তাদের থেকে একদিন বিয়োগ হবে। তাদের সঙ্গে সর্বোত্তম ব্যবহার করুন। তারা থেকে যাবে মন থেকে এই ভুল ধারণা দূর করে দিন। যা পাওয়া গিয়েছে তা সব চলে যাচ্ছে, তাহলে আর নতুন করে পাওয়ার আশা কেন করা? তাছাড়া আবার পাওয়া যাবে কি যাবে না তার নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু পাওয়া গেলে তা যে থাকবে না

সেটি নিশ্চিত। সুতরাং সেটি পাওয়ার ইচ্ছা করে নিজেকে কেন বেইজ্জত করা!

রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-শোক প্রভৃতি থাকে না বরং চলে যাচ্ছে। এগুলি সব বিনাশশীল এবং জীব অবিনাশী—**'ঈশ্বর অংস জীব অবিনাসী।'** বিনাশশীলের সঙ্গ ত্যাগ করা হলো মুক্তি আর অবিনাশীতে স্থিত থাকা হলো ভক্তি। বিনাশশীলের সঙ্গে বিযুক্তি হচ্ছেই। এই বিয়োগকে এখনই স্বীকার করে নিন। তাহলে মুক্তি এবং ভক্তি দুটিই স্বতঃসিদ্ধ হবে।

(৫) মুক্তির রহস্য

যখন আমরা গভীর নিদ্রাভিভূত হই তখন আমাদের কিছুই মনে থাকে না, এই অভিজ্ঞতা আমাদের সকলের হয়েছে। টাকা-পয়সা, জমি-জমা, আত্মীয়স্বজন কোনও কিছুই মনে থাকে না, সেইরকম অবস্থায় কি আমাদের কোনও দুঃখ হয়? গভীর ঘুমে কোনও জিনিসের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ না থাকলেও আমাদের দুঃখ হয় না, বরং আমরা সুখ অনুভব করি। তাতে প্রমাণ হয় যে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধে সুখ হয় না। আপনারা এখন মনে করছেন যে, যদি আপনারা ধনদৌলত পেয়ে যান, বড় পদ লাভ করেন, মান সম্মান পান, ভোগ, আরাম পান তাহলে আপনারা সুখী হবেন। ভেবে দেখুন যে, গাঢ় ঘুমের সময় কোনও প্রাণী বা বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকলে দুঃখ না হয়ে সুখই হয় তখন এইসব জিনিস পেলে সুখ কি করে পাওয়া যাবে? এই বিষয়ে গভীর চিন্তা করুন।

জাগৃতির বস্তু স্বপ্নে এবং স্বপ্নের বস্তু সুষুপ্তিতে থাকে না। তাৎপর্য হলো এই যে জাগৃতি এবং স্বপ্নের বস্তুগুলি ছাড়াও আমরা থাকি। এতে প্রমাণ হলো যে বস্তু ব্যতিরেকেও আমরা সুখে থাকতে পারি। অর্থাৎ আমাদের থাকা বস্তু, অবস্থা প্রভৃতির আশ্রিত নয়। এতে প্রমাণিত হলো যে বস্তু,

পদার্থ, ব্যক্তি প্রভৃতির দ্বারা আমরা সুখী হব আর ঐগুলি ছাড়া আমরা দুঃখী হব, একথা ভুল।

জাগ্রত অবস্থাতেও আমরা অনেক জিনিস ছাড়া থাকি, কিন্তু সুষুপ্তিতে সব জিনিস ছাড়াই আমরা থাকি এবং তার দ্বারা আমরা শক্তি লাভ করি। গভীর ঘুম এলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং জেগে উঠলে ব্যবহার ভাল হয়। না ঘুমালে মানুষের জীবন কষ্টকর হয়ে যায়। না ঘুমালে সে শান্তি পায় না। এতে প্রমাণিত হলো যে সকল বস্তুর অ-ভাব ছাড়াও আমরা থাকতে পারি না। বস্তুর অ-ভাব খুবই আবশ্যক, অতএব অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের এই সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হলো যে ধনসম্পদ স্বজন পেলেই আমরা সুখী হব আর ঐগুলি ছাড়া আমরা থাকতে পারব না।

সুষুপ্তিতে আমরা বস্তুগুলি ছাড়াও বেঁচে থাকি। শুধু বেঁচেই থাকি না; সুখীও হই আর শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সবেতে সজীবতা আসে। জাগ্রত অবস্থায় যখন বস্তুগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে তখন আমাদের শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে আর নিদ্রায় সেগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকায় শক্তি সঞ্চিত হয়। বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ ছাড়া নিদ্রায় আর কী হয়? যদি জাগ্রত অবস্থাতেই আমরা বস্তুগুলির সঙ্গে ভিন্ন হয়ে যাই, সেগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখি, তাদের আশ্রয় না নিই তাহলে আমরা জীবন্মুক্ত হয়ে যাব। নিদ্রায় তো বেহুঁশ (অজ্ঞান) অবস্থা থাকে, সেজন্য তাতে জীবন্মুক্ত হয় না। সকল বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হওয়া হলো মুক্তি। মুক্তিতে যত আনন্দ, বন্ধনে তত নয়। বন্ধনের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হলেই মুক্তির আনন্দ হয়। ঘুমের সময় বস্তুগুলিকে ভুলে থাকলেও যখন সুখ শান্তি পাওয়া যায় তখন জ্ঞানত সেগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করলে কতই না সুখ-শান্তি পাওয়া যাবে!

শরীর এবং সংসার এক। এগুলির একটি আর একটি থেকে আলাদা হতে পারে না। শরীরের সংসারকে প্রয়োজন এবং সংসারের শরীরকে প্রয়োজন। কিন্তু আমরা স্বয়ং (আত্মা) শরীর থেকে আলাদা এবং শরীর ছাড়াই থাকতে পারি। শরীর তৈরি হবার আগেও আমরা ছিলাম এবং শরীর নষ্ট হয়ে গেলেও আমরা থাকব—যদি এই কথা জানা না থাকে

তাহলে এটি তো জানা আছে যে গাঢ় ঘুমের সময় শরীরের স্মরণই যখন থাকে না তখনও আমরা থাকি এবং সুখেই থাকি। শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকলে শরীর সুস্থ থাকে। সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হলে আপনারাও ঠিক থাকবেন এবং সংসারও ঠিক থাকবে। দুটির ঝামেলাই দূর হয়ে যাবে। শরীরাদি বস্তুগুলির ধারণা ও দাসত্ব মন থেকে দূর করে দিলে খুবই আনন্দ হবে, এরই নাম জীবন্মুক্তি। শরীর, আত্মীয়, ধন প্রভৃতি রাখুন কিন্তু এর দাসত্ব করবেন না। যারা জড় বস্তুর দাসত্ব করে তারা জড় বস্তুরও নিচে নেমে যায়, আর আমরা তো চৈতন্যময়। জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা থেকেই আমরা ভিন্ন। এই অবস্থাগুলির পরিবর্তন হয়, কিন্তু আমাদের পরিবর্তন হয় না। আমরা এই অবস্থাগুলিকে জানি আর অবস্থাগুলিও জানার। তাই এগুলি থেকে আমরা ভিন্ন। যেমন, ছাদকে আমরা জানি যে এটি ছাদ। তাহলে বোঝা গেল যে আমরা ছাদ থেকে ভিন্ন। অতএব আমরা বস্তু, পরিস্থিতি, অবস্থা প্রভৃতি থেকে ভিন্ন—এই অভিজ্ঞতাই হলো মুক্তি।

(৬) জাগৃতিতে সুষুপ্তি

একটি খুবই সহজ কথা। সেটিকে ভাবনাচিন্তা করে গভীরভাবে বুঝে নিলে তৎক্ষণাৎ তত্ত্বে স্থিত হয়ে যাবেন। রাজার যেমন সমগ্র রাজত্বের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে তেমনি পরমাত্মার সকল বস্তু, ব্যক্তি, ক্রিয়া প্রভৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে। রাজার সম্বন্ধ মেনে নেওয়াতেই, কিন্তু পরমাত্মার সম্পর্ক প্রকৃত। আমরা পরমাত্মাকে যদি ভুলেও যাই তবু তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দূর হয় না। আপনারা যদি যুগ যুগান্তর ধরে তাঁকে ভুলেও থাকেন তবু তাঁর সঙ্গে সকলের সম্বন্ধ একই থাকে। আপনাদের স্থিতি জাগ্রত, স্বপ্ন অথবা সুষুপ্তি যে অবস্থাতেই থাক না কেন, আপনি যোগ্য অথবা অযোগ্য যাই হোন, বিদ্বান অথবা অশিক্ষিত, ধনী অথবা

নির্ধন যাই হোন পরমাত্মার সম্বন্ধ সব অবস্থায় একই থাকে। এটি বোঝার জন্য যুক্তি উপস্থিত করছি। আপনারা মানেন যে বাল্যাবস্থায় আপনারা ছিলেন, এখনও সেই আমি আছি এবং ভবিষ্যতে বৃদ্ধাবস্থাতেও সেই আমি থাকবে। বাল্যাবস্থা, যৌবন এবং বৃদ্ধাবস্থা—এই তিনটির বিভেদের জন্য 'ছিল' 'আছি' এবং 'থাকব' এই তিনের ভিন্নতা হলো, কিন্তু আপনার হওয়াতে অর্থাৎ 'আমি'তে কি কোনও পার্থক্য হলো? অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—তিনটিতে আপনার 'থাকা' (সত্তা) তো একটিই। তাই আপনারা যেমনই হোন, যেমনই থাকেন, আপনার সত্তা এক এবং অখণ্ড থাকে। আপনার নাস্তি কখনও হয় না। সেই সত্তাই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে কার্যান্বিত করে থাকে। তা শরীর প্রভৃতিতে আশ্রিত নয়। তাতে প্রমাণিত হলো যে অপনারা সদাসর্বদা 'আছে'-তে স্থিত আছেন। জড় বস্তু, ক্রিয়া প্রভৃতিতে সম্বন্ধ না রেখে 'অস্তি'-র সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে হবে। এইটি হলো জাগৃতিতে সুষুপ্তি।

সেই সত্তা মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীরাদির ক্রিয়াগুলির মধ্যে অনুসৃত অর্থাৎ একাকার সেটি মন, বুদ্ধি প্রভৃতির প্রকাশক, আধার। সেই সর্বপ্রকাশক, সর্বাধারে আমাদের স্থিত থাকতে হবে। সেই সত্তা সর্বদা যেমনকার তেমনি থাকে। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, স্থিরতা, চঞ্চলতা, যোগ্যতা, অযোগ্যতা, বাল্যাবস্থা, যৌবন, বৃদ্ধাবস্থা, বিপত্তি, পাণ্ডিত্য, মূর্খতা প্রভৃতি সবই সেই সত্তা থেকে আলোকিত হয়। বস্তুত তার সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক স্বতঃসিদ্ধ। কেবল তার দিকে লক্ষ্য এবং দৃষ্টি দিতে হবে। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির সঙ্গে সম্বন্ধই হলো মোহ। এই মোহ নাশ হলে স্মৃতি জাগ্রত হয়—'**নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা**' (গীতা ১৮/৩৬)। স্মৃতির অর্থ—যা আগে থেকেই ছিল তা মনে পড়ে গেল। কোনও নতুন জ্ঞান লাভ স্মৃতি নয়। এখন যা কিছুই হোক, কোনও প্রতিকূলতা এসেও যায় তাতে নিজের সত্তায় কী ভিন্নতা এল? কেবল নিজের সত্তার দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে, আর সেই মুহূর্তেই জীবন্মুক্তি, এতে কোনও অভ্যাস করার নেই।

সত্তার দিকে দৃষ্টি না দিলেও সে যেমনকার তেমনই থাকে। কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি না দিলে আপনারা আপনাদের স্থিতি, ক্রিয়া, বস্তু, অবস্থা, প্রভৃতিকে মানেন। ভোজন করবার সময় 'আমি খাই', যাবার সময় 'আমি যাই' প্রভৃতি সকল অবস্থায় 'আমি' সমানই থাকে। যদি 'আমি'-কে দূর করে দেন তাহলে 'আছি' থাকবে না, থাকবে 'আছে'। সেই আছে সর্বদা যেমনকার তেমনই থাকে।

খোয়া কহে সো বাবরা পায়া কহে সো কূর।
পায়া খোয়া কুছ নহী জ্যোঁও কা তেঁও ভরপূর।।

এই 'আছে-তে স্থিত হলেই অখণ্ড সমাধি, জাগ্রত সুষুপ্তি হয়ে যায়।

(৭) ত্যাগের দ্বারা সুখ প্রাপ্তি

কোনও গৃহীর যেমন তার সম্পূর্ণ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে তেমনই পরমাত্মারও সমগ্র সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে। সংসারে ভাল-মন্দ, শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট যেমন প্রাণীই থাক না কেন পরমাত্মার সম্পর্ক সকলের সঙ্গে সমান। ভগবান বলেছেন—**'সমোহহং সর্বভূতেষু** (গীতা ৯/২৯)'। কেবল প্রাণীদের সঙ্গেই নয়, পরিস্থিতি, অবস্থা, ঘটনা প্রভৃতির সঙ্গেও পরমাত্মার একরকম সম্বন্ধ থাকে। এবার ভেবে দেখুন যে কোনও মানুষের যদি বিশেষ কোনও যোগ্যতা থাকে তাহলে তার সঙ্গে পরমাত্মার কি বিশেষ সম্বন্ধ হবে? না। তার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য প্রতীত হয় তা সাংসারিক দৃষ্টিতেই হয়ে থাকে। পরমাত্মার তো সকলের সঙ্গে সমান সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধে কখনও বৃদ্ধি বা হ্রাস হতে পারে না। অতএব কোনও গুণ, যোগ্যতা বা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা আমরা পরমাত্মাকে লাভ করব—এই ভাবনা সংসারের বৈশিষ্ট্য বা গুরুত্বের দৃষ্টিতে করা হয়ে থাকে। যদি সংসার থেকে বিমুখ হয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন যে প্রত্যেকেই পরমাত্মাকে লাভ করার

অধিকারী। সাংসারিক দৃষ্টিতে যত যোগ্যতা, বৈলক্ষণ, বৈশিষ্ট্য আছে সেইগুলিকে একত্র করে পরমাত্মাকে কিনে নেবেন—এমন হতে পারে না। ভগবান বলেছেন—'**নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।**' (গীতা ১১/৫৩)

'আমি বেদের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, দানের দ্বারা কিংবা যজ্ঞের দ্বারা দৃষ্ট হতে পারি না।' খুব কঠিন তপস্যা করলেও তার দ্বারা ভগবানকে ধরা যায় না '**ন তপোভিরুগ্রৈঃ** (গীতা ১১/৪৮)। তাহলে ভগবানকে ধরা যাবে কি করে? ত্যাগের দ্বারা—'**ত্যাগচ্ছান্তিরনন্তরম্** (গীতা ১২/১২)। ত্যাগ যখন করতে হবে তখন অনেক টাকা-পয়সা হলেও ত্যাগ করতে হবে এবং কম টাকা-পয়সা থাকলেও ত্যাগ করতে হবে; যোগ্যতা বেশি হলেও ত্যাগ করতে হবে, কম যোগ্যতা হলেও ত্যাগ করতে হবে। সত্য কথাটি খুবই অদ্ভুত। সেটি হলো এই যে যেমন পাপকে ত্যাগ করতে হবে তেমনই পুণ্যকেও ত্যাগ করতে হবে। কথাটি আবোল তাবোল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু গুণের, যোগ্যতার, পুণ্যের অহঙ্কার তো ত্যাগ করতেই হবে। অহঙ্কার ত্যাগই তো আসল, বস্তুর আবার ত্যাগ কী? বস্তু তো নিজে থেকেই ভিন্ন জাগতিক। যত যোগ্যতা, পরিস্থিতি, গুণ প্রভৃতি আছে সেগুলিকে ত্যাগ করলেই তত্ত্ব লাভ হয়। তত্ত্ব প্রাপ্তিতে দেরি এইজন্যই হয় যে আপনারা যোগ্যতা, পরিস্থিতি, গুণ, ব্যক্তিত্ব, সামগ্রী প্রভৃতি ধরে রেখেছেন। এমনকি আপনারা ত্যাগকে এই বলে ধরে রেখেছেন যে 'আমি একজন বড় ত্যাগী'—এই যে ত্যাগ মনোবৃত্তি একেও ত্যাগ করতে হবে। তা না হলে পরমাত্মাকে লাভ করা যাবে না। এইভাবেই 'আমি একজন বৈরাগী'—এই ত্যাগ ভাবকেও ত্যাগ করতে হবে, নইলে বন্ধন থেকে যাবে। পরমাত্মার যেমন বৈরাগ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ তেমনই আসক্তির সঙ্গেও সম্বন্ধ। তাই আসক্তির সঙ্গেও যেমন সম্বন্ধ রাখতে নেই তেমনই বৈরাগ্যের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখতে নেই। সকল বস্তু, অবস্থা, ঘটনা, ক্রিয়া প্রভৃতির সঙ্গে পরমাত্মার সম্বন্ধ একই রকম। তাই এই সবকিছুর প্রতি বিমুখ হতে হবে। এই সবকিছুর প্রতি বিমুখ হলে তত্ত্ব লাভ হবে।

সনমুখ হোঈ জীব সোহি জবহীঁ। জন্ম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহীঁ।।

(রামচরিতমানস ৫/৪৪/১)

বাস্তবে এই সবগুলি থেকে আমরা প্রতিদিন বিমুখ হই। কেমন করে? যখন কাজ করতে করতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি তখন আমাদের মন সংসার থেকে বিমুখ হয়ে যায় এবং আমরা ঘুমিয়ে নিই। এতে বিশ্রাম হয়, শান্তি পাওয়া যায়, সুখ-আরাম পাওয়া যায়, সতেজতা আসে, আরোগ্য হয়। এই সবই ত্যাগ থেকে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, সাংসারিক ভোগের সুখও ভোগের ত্যাগের দ্বারাই পাওয়া যায়। কিন্তু এই দিকে দৃষ্টি না দেওয়ার ফলে মনে হয় যেন ভোগের দ্বারাই সুখ পাওয়া গেল। বাস্তবে ভোগের সংযোগ থেকে সুখ পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় ভোগের বিয়োগ হলে। ভোগের সংযোগের বিচ্ছেদ হলে সুখ হয়। যেমন, ভোজন করলে সুখ পাওয়া যায়, কিন্তু বাস্তবে সুখের অনুভূতি হয় ভোজন করা যখন শেষ হয়, যখন তৃপ্তি হয়। ভোগ করার পর যখন অরুচি হয়ে যায় তখন সুখ হয়। সুখ হয়ে গেলে অরুচি এসে যায়। প্রথমে যা হয় মানুষ তাকে চিনতে পারে না। কিন্তু ত্যাগ করার ফলেই যে সুখ হয় তাতে কোনও সন্দেহ নেই, বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। যত বড় বড় জিনিসের সঙ্গেই সংযোগ হোক না কেন তার দ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করা যেতে পারে না। পরমাত্মাকে সকলে সমানভাবে পেতে পারেন, তিনি যে কোনও দেশ, বেশ, সম্প্রদায়, ধর্ম প্রভৃতির মানুষ হোন না কেন। কেবল পরমাত্মাকে পাওয়ার প্রচণ্ড অকাঙ্ক্ষা থাকা চাই। পরমাত্মাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার পরিচয় হলো অন্য কোনও জিনিস না চাওয়া। কিন্তু পরমাত্মাকেও চাইবেন এবং অন্য জিনিসকেও চাইবেন এই সংশয় অর্থাৎ দ্বন্দ্ব যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ প্রাপ্তি ঘটবে না। যিনি নির্দ্বন্দ্ব হন তিনিই সুখপূর্বক মুক্ত হন—**'নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।।** (গীতা ৫/৩) ইচ্ছা-দ্বেষ থেকে উৎপন্ন এই দ্বন্দ্বও মোহ, এর মধ্যেই সবাই জড়িয়ে পড়েছেন—

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ।।

(গীতা ৭/২৭)

যিনি এই দ্বন্দ্বরূপ মোহ থেকে মুক্ত, তিনি দৃঢ়নিশ্চয় করে ভগবানের ভজন করেন—**'তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ'** (গীতা ৭/২৮)

সাংসারিক দৃষ্টিতে অযোগ্যতা অপেক্ষা যোগ্যতা অনেক শ্রেষ্ঠ। পাপ অপেক্ষা পুণ্য শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এই শ্রেষ্ঠতার দ্বারা কেউ পরমাত্মাকে কিনে নেবেন, এমন কোনও কথা নেই। তাই যিনি আন্তরিকভাবে পরমাত্মাকে চান, তিনি তাঁর নিজের স্থিতিকে ত্যাগ করে দেন, তার প্রতি বিমুখ হয়ে যান। বিমুখ হওয়ামাত্র তাঁর পরমাত্মার প্রাপ্তি ঘটে। নিজের যে স্থিতি, যে ব্যক্তিত্ব, নিজের যে যোগ্যতা বা অযোগ্যতা তাকে আঁকড়ে থাকা হলো পরমাত্মাকে লাভ করার বাধা। তাই এই সত্য-তত্ত্বকে প্রাপ্ত করায় কেউ অনধিকারী, অযোগ্য, অপাত্র নয়। কেবল উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তুকে ধরে রাখাই হল প্রধান বাধা, এই বাঁধন ছিঁড়ে গেলেই তাঁর প্রাপ্তি ঘটবে।

যখন ক্ষুধা পায় তখন ভোজনে সুখ পাওয়া যায়। এটি নির্বিবাদী সত্য। মনে করুন, প্রথম গ্রাসে যতটা সুখ পাওয়া যায়, পাঁচ-ছ'টি গ্রাস নেওয়ার পর কি আর সেই সুখ থাকে? যতই আমরা ভোজন করতে থাকি ততই ভোজনের সুখ কম হতে থাকে। তারপর ভোজন যখন শেষ হয়ে যায়, তৃপ্তি হয়ে যায় তখন ভোজন কি আর আপনাকে সুখ দেয়? ক্ষুধা যখন মিটে যায় তখন গ্রাস নিয়ে দেখুন, তা সুখ দেয় কিনা? সুখের আরম্ভ রুচি থেকে হয়েছিল। তাই সাংসারিক ভোগ আপনাদের তখনই সুখ দেবে যখন তা না পেলে আপনারা দুঃখিত হবেন। যা না পেলে আপনারা দুঃখিত হন না তা কখনও আপনাদের সুখ দিতে পারে না। তাই এই সংসার দুঃখীকে সুখ দেয় এবং সুখ দিয়ে মানুষকে বেঁধে ফেলে। কেবল এই ভ্রম থাকে যে অসুখ পদার্থের দ্বারা সুখ পাওয়া গিয়েছে।

এইবার অরুচি থেকে সুখ কি করে পাওয়া যায় সেই কথাটি বুঝুন। কোনও ভোগে অরুচি না হলে কি আপনারা সেই ভোগকে ত্যাগ করেন? যখন অরুচি হয়ে যায় তখনই ত্যাগ হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত অরুচি না হয় ততক্ষণ সুখ হয় না এবং যতক্ষণ রুচি থাকে ততক্ষণ সুখ হয়। এই কথা আমি আগেই বলে দিয়েছি যে অরুচি থেকে সুখ হয়, নাকি সুখ থেকে

অরুচি হয়—এর বিশ্লেষণ করা শক্ত, কিন্তু দুটি কথাই সত্য। ভোগ করতে করতে তাতে অরুচি এসে যায়। এবার আপনি মন দিন। অরুচির অর্থ হলো—সম্বন্ধ- বিচ্ছেদ। ভোগের দ্বারা সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হলে সুখ হয়। সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ কী—এই বিশেষ কথাটি জানার দরকার। বিচ্ছেদের তাৎপর্য হলো সেই ভোগকে ভোগ করার শক্তির বিনাশ অর্থাৎ আর ভোগ করা যায় না। তাহলে শক্তির বিনাশেই অরুচি এবং সুখ দুটিই হল। শক্তির বিনাশ না হলে অরুচি কি করে হোত? তাৎপর্য হলো এই যে সেই দুখ ভোগজনিত নয় বরং শক্তির বিনাশে অর্থাৎ ক্লান্তিতে। অনেকক্ষণ দৌড়াবার পর যখন বসা হয় তখন ভাল লাগে, সুখ হয়। তাহলে সুখ ক্লান্তির। অতএব ভোগ করবার শক্তির বিনাশের নামই হলো সুখ। নাশ বলতে পারেন, অরুচিও বলতে পারেন। ভোগী পুরুষ ভোগ্য-বস্তুর বিনাশ তো করেন এবং নিজের বিনাশ ঘটান।'বৈরাগী পুরুষ তা করেন না। মানুষ ভোগে সুখ মনে করে তাকে ত্যাগ করে না। তাই ভোগের অবসানে অরুচিকে না পারে স্থায়ী করতে, এবং না পারে ত্যাগের সুখকে স্থায়ী করতে। যদি সে বুঝতে পারে যে ভোগের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদই হলো সুখ তাহলে সে ভোগে জড়াবে না।

(৮) তত্ত্ব প্রাপ্তিতে সকলেই যোগ্য

সত্য-তত্ত্ব সকলের কাছেই স্বতঃপ্রাপ্ত, কিন্তু সেদিকে আমাদের দৃষ্টি যায় না, সেজন্য তা অপ্রাপ্ত মনে হয়। যেমন, আপনারা কিছু করুন, অথবা নাই করুন, আপনারা অবিদ্যমান একথা কি কখনও মনে হয়? আমি নেই—নিজের সত্তার এইরকম অবিদ্যমানতার অনুভূতি কখনও কারও হয় না, হতে পারে না। এতে প্রমাণিত হলো যে নিজের ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতা সদা-সর্বদা থাকে। ক্রিয়াগুলির মধ্যে প্রভেদ থাকতে পারে, কিন্তু নিজেদের অস্তিত্বে ভিন্নতা হয় না। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি ক্রিয়াগুলির দিকে থাকে,

নিজেদের বিদ্যমানতার দিকে থাকে না। তারা উচ্চ-নীচ, উত্তম-অধম, বিহিত-নিষিদ্ধ প্রভৃতি কর্ম করতে থাকে এবং নিজেদের সেই কর্মের কর্তা মনে করে। কিন্তু তাদের দৃষ্টি সেই তত্ত্বের দিকে যায় না যেখানে কর্তা টিঁকে আছেন, যিনি কর্তার প্রকাশক, আশ্রয় এবং অধিষ্ঠান। সেই জ্ঞান তথা প্রকাশরূপ নির্বিকল্প তত্ত্ব কখনও অবিদ্যমান হয় না। তাই নিজ-ভাব (বিদ্যমানতা) সর্বদা থাকে। এইটি হলো নিজের স্বরূপ, এর জ্ঞানই হলো স্বরূপের জ্ঞান। এইদিকে দৃষ্টির উন্মেষ হওয়াই হলো স্বরূপ-বোধ।

প্রথমে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হবে, তারপর তার অনুভূতি হবে—এটি হলো শাস্ত্রীয় পদ্ধতি এবং তা খুবই যথার্থ। কিন্তু অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হলে আমরা তত্ত্ব প্রাপ্তির অধিকারী নই, একথা আমি মনে করি না। সকল মানুষই তত্ত্ব প্রাপ্তির অধিকারী। ভগবান তাঁর অকারণ কৃপায় জীবকে মনুষ্য-শরীর দেন—"**কবহুঁক করি করুনা নর দেহী। দেত ঈস বিনু হেতু সনেহী।।**' (মানস ৭/৪৪/৩) মনুষ্য শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির পূর্ণ অধিকারও ভগবান প্রদান করেন। পরমাত্মাপ্রাপ্তির জন্যই মনুষ্য-শরীর পাওয়া গিয়েছে। যে পরমাত্মাকে লাভ করতে পারবে না তাকে মানুষ করবেন—এমন ভুল ভগবানের দ্বারা হতেই পারে না। সরকারও কোনও পদে কাউকে নিযুক্ত করার সময় সেই পদের যে যোগ্য তাকেই নিযুক্ত করেন। কোনও চাষীকে কেউ হেড মাস্টারের পদে বসান না। সুতরাং ভগবানের কি এমন ভুল হবে যে তিনি যে মানুষের যোগ্য নয় তাকে মানুষ করে দিলেন—এমন হতেই পারে না। মনুষ্য-শরীর যখন পাওয়া গিয়েছে তখন তত্ত্ব প্রাপ্তির পূর্ণ অধিকারও পাওয়া গিয়েছে। এখন মানুষ যদি নিজে নিজেই তার হার স্বীকার করে নেয় তবে সেটি তার ভুল। বলা হয় যে অশুদ্ধ অন্তঃকরণের মানুষ তত্ত্বকে জানবেন কি করে? আমি বলি যে অশুদ্ধ অন্তঃকরণের মানুষ অন্তঃকরণের দ্বারা তত্ত্বকে জানতে পারে না, কিন্তু তত্ত্বতো অন্তঃকরণের অতীত। স্বয়ং (নিজের বিদ্যমানতা) কি অন্তঃকরণের আশ্রিত? না। অন্তঃকরণ তো করণ আর স্বয়ং কর্তা। করণ কর্তার অধীন হয়ে থাকে। কর্তা কখনও করণের অধীন হয় না। যার দ্বারা

আমরা কাজ করি সেই কাজ করার যন্ত্রের নাম হলো করণ। যে কাজ করে তার নাম হলো কর্তা। যে ক্রিয়াগুলি করণের দ্বারা করতে হয় সেগুলি কর্তা করণ ছাড়া করতে অক্ষম, কিন্তু করণের অতীত তত্ত্ব অর্থাৎ আপনি আপনাতে (স্বয়ং-এ) স্থিত হবেন তাতে অক্ষম কি করে? যে অন্তঃকরণের দ্বারা স্বয়ং-কে জানতে চায় সে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলেই জানতে পারবে, কিন্তু আমরা অন্তঃকরণের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদই যদি করে দিই তাহলে তাকে কেন জানতে পারব না; কেননা কর্তা (স্বয়ং) করণ (অন্তঃকরণে)-এর অধীন নয়। করণ ভিন্ন ভিন্ন হয় আর তার দ্বারা কৃত ক্রিয়াগুলিও ভিন্ন ভিন্ন হয়, কিন্তু কর্তা এক।

স্বয়ং (নিজস্ব স্বরূপ) সর্বদা নিষ্ক্রিয় থাকে। যখন কর্ম সামনে আসে তখন কর্তৃত্বাভিমানের কারণে সে কর্মের কর্তা হয়ে যায়। স্বরূপত সে বাস্তবে অকর্তাই থাকে। জাগৃতি, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি—এই তিনটি অবস্থাতেই সে যেমনকার তেমনই থাকে, তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করাই হলো স্বরূপবোধ।

একটি কথার উপর আপনারা বিশেষ দৃষ্টি দিন। আমাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হবে, তবেই আমরা তত্ত্বকে জানব—এটি হলো ভবিষ্যতের আশা। তত্ত্ব ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান—তিনটিতেই আছে এবং তিনটির অতীতও। এমন কোনও দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, অবস্থা, পরিস্থিতি প্রভৃতি নেই যেখানে তত্ত্ব নেই। সেই তত্ত্বে দেশ, কাল, বস্তু প্রভৃতি কিছুই নেই। কথাটি যখন এই তখন বলুন যে কোন্ দেশ, কাল, বস্তু, পরিস্থিতি প্রভৃতিতে আমরা তাঁকে জানতে পারি না বা প্রাপ্ত করতে পারি না? আমাদের মধ্যে করণ নেই, তাঁর মধ্যেও করণ নেই, তাহলে তাঁকে জানতে দেরি কিসের? করণের দ্বারা যদি তাঁকে জানতে চাও তাহলে করণকে শুদ্ধ করতে হবে। আর করণের দ্বারা কেউ সেই তত্ত্বকে জানতে পেরেছে এমন কখনও হয়নি।

তত্ত্বকে জানার জন্য বেদান্তের যে প্রক্রিয়া তাতে প্রথমে বিবেক, বৈরাগ্য, সমাধি, ষটসম্পত্তি এবং মুমুক্ষা—এই সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন হতে

হয়। এর পর শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন—এই তিনটি সাধনা করতে হয়। এর পর তত্ত্বপদার্থের সংশোধন হয়। তত্ত্বপদার্থ সংশোধনের পরে সবীজ সমাধি হয়। এতদূর পর্যন্ত অন্তঃকরণ (প্রকৃতি) সঙ্গে থাকে। অন্তঃকরণের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে গেলে নির্বীজ সমাধি হয়। যখন নির্বীজ সমাধি হয়, তখন তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়। এই প্রক্রিয়া হলো অন্তঃকরণের দ্বারা তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য। কিন্তু আমি বলি যে এত সব করবার দরকার নেই, তত্ত্বে এখনই স্থিত হওয়া সম্ভব। কেবল তাঁকে প্রাপ্ত করার অভীপ্সায়, উৎকণ্ঠায় ন্যূনতা আছে। এইজন্যই দেরি হচ্ছে। আমি কাউকে তত্ত্ব প্রাপ্তির জন্য অযোগ্য মনে করি না, কেবল তাঁকে পাওয়ার ইচ্ছা কম বলে মনে করি। ইচ্ছায় যদি ন্যূনতা না থাকে তাহলে তত্ত্বকে জেনে নেবে—পাকা কথা।

তত্ত্ব তো সবসময় যেমনকার তেমনই থাকে। তাঁকে তৎক্ষণাৎ জানা যেতে পারে, কেবল সেদিকে দৃষ্টি নেই। এটিকে এভাবে মনে করুন—আমরা চোখ দিয়ে সবকিছুকে দেখি, কিন্তু অন্য কিছু দেখার আগে আলোই আমাদের দৃষ্ট হয়। প্রথম হলো আলো তারপর বাকি সবকিছু দৃষ্ট হয়। তার কারণ আলোর মধ্যে দিয়েই সবকিছু দৃষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু লক্ষ্য না থাকায় আমাদের দৃষ্টি প্রথমে আলোর দিকে যায় না—

জো জ্যোতিয়োঁকা জ্যোতি হ্যায়, সবসে প্রথম জো ভাসতা।
অব্যয় সনাতন দিব্য দীপক, সর্ব বিশ্ব প্রকাশতা।।

এই তত্ত্ব সর্বপ্রথমেই পরিলক্ষিত হয়। সবকিছুই তার অন্তর্গত। সেইসব করণকে প্রকাশ করে, তার দ্বারাই সবকিছু জানা যায়। এইজন্য আপনাদের কাছে নিবেদন, আপনারা তত্ত্ব প্রাপ্তিতে নিজেদের অযোগ্য মনে করবেন না। আপনাদের মধ্যে একটি জিনিসেরই অভাব আমি মনে করি আর তা হলো এই যে আপনাদের মধ্যে এই তত্ত্বকে জানার উদগ্র অভীপ্সা নেই।

তত্ত্ব প্রাপ্তিতে ভবিষ্যতের কোনও কথাই নেই। যে বস্তু উৎপন্ন হয়, যা ক্রিয়াজনিত, যা দূর দেশে অবস্থিত, যার কিছু পরিবর্তন আবশ্যক—এই-রকম জিনিসের প্রাপ্তিতে সময়ের অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু তত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধ

এবং দেশ ও কালে পরিপূর্ণ, তাকে লাভ করতে সময় লাগবে কেন? সকল দেশ, কাল, বস্তু, অবস্থা, পরিস্থিতি প্রভৃতিতে আপনার স্বতঃসিদ্ধ সত্তা বিদ্যমান। সেটি অখণ্ড সত্তা। তা লাভ করতে সকলেই যোগ্য, সকলেই অধিকারী।

(৯) অহঙ্কার সকলকে দুঃখ দেয়

অহঙ্কারকে দূর করা যায় কি করে? এই বিষয়ে চিন্তা করার পর মনে হলো যে মানুষ যদি অপরের সঙ্গে নিজের তুলনা না করে তাহলে অহঙ্কার থেকে মুক্ত হতে পারে। যেখানে কেউ অপরের সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে দেখেছে সেখানেই অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়েছে। সকল দুঃখ এবং পাপের মূল হলো অহঙ্কার। একটি হলো অহঙ্কার এবং অপরটি হলো কামনা—এই দুটি এমনই দোষ যে এই দোষ দুটি থাকলে আর কোনও দোষ বাকি থাকে না। কোনও দোষ বাকি থাকে না এবং কোনও পাপও বাকি থাকে না, আর সংসারে অধঃপতন করাবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি যে সকল দুঃখ, সন্তাপ, জ্বালা, আপদ, কান্না, কাকুতি, নরক, কারাগার প্রভৃতি সবকিছু অহঙ্কার এবং কামনা—এই দুটি থেকে হয়ে থাকে।

যতক্ষণ অহঙ্কার থাকে ততক্ষণ স্বভাব খারাপ থাকে, তার সংশোধন হয় না। তাহলে কী করবেন? কেবল নিজের দিকে দেখুন, অপরের দিকে তাকাবেন না। অপরে ভাল করছে, নাকি খারাপ করছে সেদিকে দৃষ্টি দেবেন না। সেদিকে দৃষ্টি দিলেই অহঙ্কারের সৃষ্টি হবে।

তেরে ভাবে কছু করো, ভলো বুরো সংসার।
'নারায়ন' তূ বৈঠিকে, অপনো ভবন বুহার।।

যে নিজেকে গুণবান মনে করে, সে অপরকে দুঃখ দেয়। মন দিন। সেটি এইরকম—যার কাছে সেই গুণ নেই সেটি তাকে বিদ্ধ করতে থাকবে।

আর আপনি যদি গুণবান না হন, দোষী হন তাহলে সেই দোষ অন্যকে বিদ্ধ করবে, আপনাকে তো করবেই। তাই অপরকে দুঃখ থেকে আর নিজেকে অহঙ্কার থেকে বাঁচানো একই কথা। কোনও কথায় যদি অহঙ্কার হয় তাহলে অপরের তো দুঃখ হবেই। একমাত্র পারমার্থিক সুখই হলো এমন জিনিস যাতে বিভোর হয়ে থাকলে নিজেরও সুখ হয় এবং অন্যেরও সুখ হয়। নইলে সংসারে এমন কোনও সুখ নেই যা অপরকে দুঃখ না দেয়। তাই সুখভোগী অন্যের দুঃখদায়ী, অন্যের হিংসা উদ্রেককারী হয়ে থাকে। যিনি সংসারের সুখ ভোগ করেন তিনি নিজের অর্থ, বিদ্যা; বল এবং ন্যায্য শাস্ত্রবিহিত ভোগ প্রভৃতির সুখ ভোগ করলেও অপরকে দুঃখ দিয়ে থাকেন। আপনারা যদি কোনও বস্তু থেকে সুখ পান তাহলে সেই বস্তু হলো অন্য কারও না-পাওয়া, তবেই আপনি সুখ পেয়েছেন। তার কারণ সংসারের সকল অনুকূল বস্তু সীমিত। কোনও সাধু সন্তের কাছ থেকে দুঃখ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেই দুঃখ অন্যরকম। তাঁর দেওয়া পারমার্থিক সুখ অন্যকে দুঃখ দেয় না। তবে অন্যে নিজের স্বভাববশত তাকে সুখী দেখে দুঃখিত হয়ে যায়। অতএব সেই দুঃখ হলো অন্যের স্বভাবের ফল। সাধু-সন্তেরা সেই দুঃখের কারণ নন। যারা নিজেদের বুদ্ধিমত্তা অথবা চতুরতার দ্বারা সাংসারিক পদার্থগুলি প্রাপ্ত করে তা থেকে সুখভোগ করে তারাই অপরকে দুঃখ দেয়। পারমার্থিক সুখে সুখী ব্যক্তি অপরকে দুঃখ দেন না, কিন্তু অপরে দুঃখ নিয়ে নেয়। যেমন, শিবলিঙ্গ তো পূজা করবার জন্য কিন্তু তাই দিয়ে যদি কেউ মাথা ফাটায় তাহলে কী করবেন? তাই সাংসারিক সুখী ব্যক্তিই দুঃখ দিয়ে থাকে।

এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কথা যে দুঃখ না দিয়ে সুখভোগ করা যায় না। সেই সুখভোগ কাউকে না কাউকে পরাধীন করবেই। সুখভোগের দ্বারা সুখভোগের বস্তুর বিনাশ এবং নিজের পতন হয়ে থাকে। এ থেকে কেউ রক্ষা পেতে পারে না। তাই যে কোনও ভাবে সুখ ভোগ করা হলো নরকের রাস্তা।

মূল যে কথাটি আমি বলেছি, সেটি মনে রাখুন। কথাটি হলো সংসারে সুখ সীমিত। তার উৎপত্তি ও বিনাশ হয়। যে বস্তু সীমিত তাকে সবাই পেতে চায়। তাহলে সেই বস্তুর ভাগ তো হবেই। যা পারমার্থিক সুখ তা অসীম। তাই তার ভাগ হয় না। অসীমভাবেই তা সকলে পেয়ে থাকে । যেমন কোনও মায়ের যদি দশটি সন্তান থাকে তাহলে সেই মা তাঁর সন্তানদের ভাগের মধ্যে থাকেন না অর্থাৎ কোনও একজনের কাছে তাঁর এতটুকু ভাগ, বাকিটা অন্যদের! মা তো সকলের কাছে সবটাই থাকেন। সেইরকম ভগবানও সকলের কাছে পূর্ণভাবে থাকেন।

কামনার যদি সম্পূর্ণ বিনাশ হয় তাহলে অহঙ্কারও দূর হয়ে যাবে। আর অহঙ্কার যদি সম্পূর্ণ দূর হয় তাহলে কামনারও অবসান হবে। এগুলি বিনষ্ট হলে জড়তা (সংসার)-এর সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং দুঃখ, দোষের অবসান হবে।

(১০) সাংসারিক সুখ দুঃখের কারণ

যারা সংসর্গজনিত সুখ নিয়ে থাকে তারা নিজেদের এবং জগতের ক্ষতি করে। সংসর্গজনিত যত সুখ আছে সবগুলিই দুঃখের কারণ—'**যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখয়োনয় এব তে** (গীতা ৫/২২)। সুখ ভোগকারী ব্যক্তি নিজের এবং জগতেরও দুঃখের কারণ হয়ে যায়। অর্থাৎ সকলকে দুঃখ দেয়, সকলকে হিংসা করে। এইজন্য হিংসা জগতের সুখভোগ ছাড়া হয় না। কিন্তু যিনি সর্বত্র পরমাত্মাকে দেখেন তিনি নিজেকে এবং অন্যকে হিংসা করেন না—

সমং পশ্যন্হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।।

(গীতা ১৩/২৮)

যিনি সর্বত্র পরমাত্মাকে দেখেন তিনি এক বিশেষ আনন্দে স্থিত হন; সেই আনন্দ হল হিংসাশূন্য। কেননা সেই আনন্দ বা সুখ হলো নিজের স্বরূপ—

ঈশ্বর অংস জীব অবিনাশী। চেতন অমল সহজ সুখরাসী।।

(মানস ৭/১১৭/১)

সাংসারিক সুখভোগী ব্যক্তিকে দেখে অন্যের মনে দুঃখ হয়। নিজের কাছে সেই সুখ না থাকায় তার হৃদয়ে জ্বালা হয়, দুঃখ হয়। অতএব অন্যের দুঃখের কারণ হয়ে যাওয়া সুখভোগী ব্যক্তি হিংসার কারণ হয়ে যায়। এখন যদি কেউ বলে যে জীবন্মুক্ত মহাত্মার কাছে জাগতিক সুখসামগ্রী আছে, আর তাকে দেখেও অন্যের মনে জ্বালা হয়। কিন্তু বাস্তবে মহাত্মা অন্যের দুঃখের কারণ হন না। কারণ জীবন্মুক্ত মহাত্মা জাগতিক সুখ ভোগ করেন না। তাঁর দৃষ্টিতে সমস্ত সাংসারিক সুখ দুঃখরূপই হয়ে থাকে—**'দুঃখমেব সর্বং বিবেকিন** ; (যোগদর্শন ২/১৫)। তাই তাঁর দৃষ্টিতে জাগতিক সুখ বলে কিছু নেই। তিনি তো নিজ-সুখেই নিজের মধ্যে সুখী থাকেন, তাঁর সুখ পরমাত্মায়। যে দুঃখিত হয়ে আছে, তারও স্বরূপ সুখরূপই—**'চেতন অমল সহজ সুখরাসী।'** কিন্তু সে নিজে নিজ-সুখে বিমুখ হয়ে দুঃখ পাচ্ছে। যদি সেও জাগতিক সুখে বিমুখ হয়ে নিজের সুখময় স্বরূপে স্থিত হয়ে যায় তাহলে উভয়েই সুখী হয়। এই সুখের বন্টন হয় না। কোনও মহাপুরুষের কাছে যদি জাগতিক সুখ ও দুঃখ এসেও যায় তাহলেও সেগুলি তাঁকে সুখ বা দুঃখ দিতে পারে না, তিনি সমুদ্রের মতো শান্ত এবং পূর্ণ থাকেন—

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎকামা যং প্রবিশন্তি সবে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামচামী।।

(গীতা ২/৭০)

যেমন সমস্ত জল সমুদ্রে এসে মিশে যায় আর সমুদ্র নিজের সীমার মধ্যে শান্ত থাকে, তেমনই জগতের সকল সুখ এলেও জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ নিজের সীমায় স্থিত থাকেন; শান্ত থাকেন। কিন্তু ভোগাকাঙ্ক্ষী মানুষ কখনও সুখী থাকতে পারে না। ভোগ না হলে, ভোগ্যবস্তু না থাকায় সে

দুঃখিত হয়, আর যদি ভোগ করে তবে তার জন্য অহঙ্কার করে দুঃখ পায়। যেমন, দাদ হলে চুলকানি ও জ্বালা দুই হয়, চুলকালে ভাল লাগে, জ্বালা কষ্টকর। তাই জাগতিক ভোগ পেয়ে গেলে যে সুখ হয় সেও এক রকমের ব্যথাই। জীবন্মুক্ত মহাত্মা যত কিছুই বস্তু পান না কেন তিনি শান্তই থাকেন আর যদি বস্তু নাও পান তাহলেও তিনি শান্ত থাকেন। তাঁর শান্তি বস্তুর অধীন নয়। তিনি তো সাধনাবস্থাতেও সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমান থাকেন। তাহলে সিদ্ধ অবস্থাতেও সম থাকবেন, এতে বলার কি আছে!

জাগতিক বস্তুসমূহ কাছে থাকলে যার অহঙ্কার হয়, সে হিংসা করে। তেমনই যে গুণের জন্য অহঙ্কার করে সেও হিংসা করে। গুণ তো আসে-যায়, তাকে নিয়ে যদি অহঙ্কার করা হয় তাহলে যার মধ্যে সেই গুণ নেই, তার মনে জ্বালা সৃষ্টি হয়; কেননা সেও তো কারুর চেয়ে কম নয়। সকলেই পরমাত্মার অংশ; অতএব স্বরূপত সমান। যে বস্তু আসা-যাওয়া করে তাকে নিয়ে সুখী হওয়া ভুল। যে নিজেকে বড় এবং অপরকে ছোট মনে করে তাকে নিন্দা করে, সেও হিংসা করে। নিজেকে অপরের অপেক্ষা বিশিষ্ট অনুভব করাও ভোগ কেননা তার দ্বারা অপরের মনে হিংসার উদ্রেক হয়। মান-সম্মানের সুখভোগীও হিংসা করেন; কেননা তিনি নিজেকে মান-সম্মানের যোগ্য মনে করে অহঙ্কার করেন এবং অন্যকে অযোগ্য মনে করে তার নিন্দা করেন। তিনি মনে করেন যে অন্যেরও যদি মান বৃদ্ধি হয় তাহলে তাঁর সম্মানে আঘাত লাগবে। তেমনই কর্মবিমুখ মানুষ যখন আলস্যে সুখভোগ করে তখন অন্যেরা বলে থাকে যে দেখ আমরা শ্রম করি আর এরা বসে বসে মজা লুটছে। এটিও হিংসা। তাই জাগতিক সুখভোগীরা নিজেরা তো দুঃখ পায়ই, অপরকেও দুঃখ দেয়।

সমস্ত ভোগ দুঃখের কারণ। জাগতিক সুখ আগে ছিল না, পরেও থাকবে না। স্বয়ং অবিনাশী হওয়া সত্ত্বেও এইরকম বিনাশশীল সুখের বশীভূত হওয়া হলো নিজেকে হত্যা করাই। সুখভোগী মানুষ কখনও পাপ এবং দুঃখ থেকে বাঁচতে পারে না। এইজন্য যে নিজের কল্যাণ চায় তার পক্ষে প্রয়োজন হলো কোনও বস্তু, পরিস্থিতি, ব্যক্তি প্রভৃতির দ্বারা প্রসন্নতা অথবা সুখের অনুভব না করা। এইগুলি থেকে যারা প্রসন্ন হয়

তারা মুক্ত হয় না, কর্মযোগে এইটিই হলো বিশেষ কথা। কর্মযোগী সকল কর্তব্য-কর্ম করেন, কিন্তু সংশ্রবজনিত সুখের ভোগ করেন না। কোনও কিছু দিয়ে তিনি প্রসন্নতা ক্রয় করেন না।

ত্যাগেই সুখ। যে মানুষ বৈরাগী, ত্যাগী, তাঁকে দেখে অন্যেরও সুখ হয়। অতএব যিনি সংশ্রবজনিত সুখের ভোগী নন সেইরকম ত্যাগী পুরুষ অন্যকে সুখ প্রদান করেন এবং জগতের খুব উপকার করেন। ত্যাগী মহাপুরুষ সংসারের যত উপকার করেন তত উপকার আর কেউ করতে পারে না। তাঁকে দেখে, তাঁর কথা শুনেও অন্যের সুখ হয়। এইরকম মহাপুরুষ যদি একান্তে বসে থাকেন তাহলেও তিনি জগৎকে সুখ প্রদানকারী হন—

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ভবেৎ।।

নিজের প্রতি বৈরীভাব যিনি রাখেন, তাঁকেও তিনি সুখ প্রদান করেন। যার মনে গর্ববোধ এবং স্বার্থ নেই, যাঁর ভাব হলো অন্যকে সুখ প্রদান করা; ভগবানের সেই শক্তির সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে যান, যে শক্তি সমগ্র জগৎকে পালন করছে। এইজন্য ভগবানের দ্বারা সাধিত উপকারে তিনি মাধ্যম হন এবং তাঁর দ্বারা সাধিত উপকারে ভগবান মাধ্যম হন। যে সুখের ইচ্ছা এবং সুখভোগ করে সে নিজের এবং জগতের ক্ষতি করে। আর যিনি জাগতিক সুখ ত্যাগ করেন এবং ভগবানের অনুরাগী তিনি সমগ্র জগতের উপকার করেন।

(১১) আমাদের সম্বন্ধ জগতের সঙ্গে নয়

লোকেরা এইরকম ধারণা করে রেখেছে যে জাগতিক বস্তু প্রাপ্তির জন্য যেমন উদ্যোগ করতে হয় তেমনই ভগবানকে পাওয়ার জন্যও উদ্যোগ করতে হবে। লোকেদের এমন সংশয়ও হয় যে বিনা উদ্যোগে মুক্তি কি

করে পাওয়া যাবে? আসলে এই কথাটি ভালভাবে বোঝা হয়নি বলেই সংশয় জাগে। আপনারা মনে রাখুন যে, পরমাত্মা সকল দেশ, কাল, বস্তু প্রভৃতিতে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান। সাংসারিক বস্তু যেমন কর্মের দ্বারা প্রাপ্ত হয় পরমাত্মাকে সেইভাবে প্রাপ্ত করা যায় না। জাগতিক বস্তুসমূহের মতো পরমাত্মাকে তৈরি করা যায় না অথবা কোথাও থেকে নিয়ে আসাও যায় না। পরমাত্মাও হাজির এবং আমরাও হাজির।

দেস কাল দিসি বিদিসিহু মাহীঁ। কহহু সো কহাঁ জহাঁ প্রভু নাহীঁ।।

(রামচরিতমানস ১/১৮৫/৩)

আমাদের শরীর ভাল-খারাপ হয়, পৃথিবীও সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়, একমুহূর্তও টিকে থাকে না। কিন্তু পরমাত্মা এবং তাঁর অংশ আমরা স্বয়ং সদা সর্বদা যেমনকার তেমনই থাকি। তাই পরমাত্মাকেও তৈরি করতে হয় না, নিজেদেরও তৈরি করতে হয় না। তাহলে আমাদের কী করা বাকি রইল? যেগুলি বিনষ্ট হচ্ছে, এই সংসারের দিকে আমাদের যে আকর্ষণ, একে যে ধরতে চাই, রাখতে চাই—ব্যাস এইটিই হলো ভ্রান্তি। একেই দূর করতে হবে। এই ভুলের জন্যই আমরা দুঃখ পাই। যা থাকবে না, যা চলে যাবেই তাকে নিজেদের কাছে ধরে রাখবার ইচ্ছাকে দূর করতে হবে। আর কিছু করতে হবে না। পরমাত্মাও মজুত এবং আমরা মজুত আর পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধও মজুত। সংসারের সঙ্গে আমাদের সত্যকার সম্বন্ধ নেই। আমরা কেবল মেনে নিয়েছি যে তা আছে। আমরা থেকে যাই আর সংসার থাকে না, চলে যায়। এদের মধ্যে সম্বন্ধ কি করে হবে? সংসারের সঙ্গে আমরা সম্বন্ধ মেনে নিয়েছি আর যার সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্বন্ধ তাকে ভুলিয়ে দিয়েছি, তাকে মানিনি, এইটিই হলো ভুল। যদি চান তো মেনে নিন যে পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্বন্ধ। আর যদি চান তো মেনে নিন যে সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নেই।

ভালভাবে, গভীরে প্রবেশ করে একটু ভেবে দেখুন যে সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কোথায়? শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কোথায় আছে? এগুলি তো গড়ে ওঠে আবার ভেঙে যায়, এগুলির

মধ্যে পরিবর্তন হয় কিন্তু আমরা যেমনকার তেমনই থেকে যাই। এটি যদি যথার্থ অনুভবে না আসে তাহলেও এই কথাটি পাকাপাকি মেনে নিন যে সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নেই। আপনারা বলেন যে সংসারের সম্বন্ধ যায় না, কিন্তু আমি বলি যে সংসারকে ধরে রাখবার সামর্থ্য কারও নেই। কথাটি একেবারে খাঁটি। শিশুকালকে আপনারা আর কবে ছেড়েছেন? কিন্তু তা চলে গিয়েছে। সবকিছুই ছেড়ে চলে যাচ্ছে—এটি খাঁটি কথা। খাঁটি কথাকে আপনারা সম্মান করুন। এইটুকু করুন যে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ চলে যায় না, টিকে থাকে—এই ধারণাটি আপনারা ত্যাগ করুন। সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ বিনা প্রয়াসে নিজে থেকেই চলে যাচ্ছে।

আমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ মেনে বসে আছি, সেইজন্য তাকে ছাড়তে সময় লাগবে, এমন কথাই নয়। পর্বতের গুহায় লক্ষ লক্ষ বছরের অন্ধকার থাকে, কিন্তু সেখানে যদি কেউ আলো জ্বালায় তাহলে সেই অন্ধকার দূর হতে কত বছর লাগবে? আলো জ্বালামাত্রই অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। তেমনই জ্ঞান হওয়ামাত্র মিথ্যা সম্বন্ধ দূর হতে সময় লাগে না। আপনারা দয়া করে এই কথার দিকে মন দিন। একান্তে বসে চিন্তা করুন, যদি বুঝতে পারা না যায় তাহলেও কথাটি ঠিক। ভগবান, শাস্ত্র, সাধু-সন্ত, ঋষি-মুনি, অভিজ্ঞ মহাপুরুষ সকলেই বলে থাকেন যে সংসারের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নেই। আপনারাও প্রত্যক্ষ করেন যে সম্বন্ধ থাকে না, নিরন্তর চলে যায়। কিন্তু আপনারা এ দিকটা ভেবে দেখেন না। যদি এই কথা মান্য করেন তাহলে মেনে নেওয়া সম্বন্ধ চলে যাবে।

সংসারের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্বন্ধ নেই। এই কথাটি সত্য হলেও আপনারা এটি স্বীকার এইজন্যই করতে পারেন না যে আপনারা এটিকে মন ও বুদ্ধির দ্বারা বিচার করেন এবং মন ও বুদ্ধির অতীত যে স্বয়ং সেই পর্যন্ত পৌঁছান না। এটি বড় ভুল। আপনারা স্বয়ং কী? শিশুকালে যে আপনি ছিলেন এখনও সেই আপনিই আছেন। তাহলে বাল্যকালাদি অবস্থাগুলি বদলে গিয়েছে কিন্তু আপনি বদলে যাননি। আপনাদের

বিদ্যমানতা যেমনকার তেমনই থেকে গিয়েছে। এর সঙ্গে সংসারের সম্বন্ধ নেই। যে মন-বুদ্ধির দ্বারা আপনারা চিন্তা করেন তাও নষ্ট হয়ে যাবে, বিযুক্ত হয়ে যাবে। অতএব বিচ্ছেদশীল বস্তুর ভরসায় বিচ্ছেদশীল বস্তু কি করে টিকে থাকবে? দুটি একই ধাতুর, একই প্রকৃতির। পরিবর্তনশীল বস্তুর সঙ্গে অপরিবর্তনীয় বস্তুকে মেলাবেন না। এইটুকুই কথা। বাল্যাবস্থা যেমন চলে গিয়েছে তেমনই যুবাবস্থা, বৃদ্ধাবস্থাও চলে যাবে; কিন্তু আপনার বিদ্যমানতা তেমনই থাকবে। অতএব পরিবর্তনশীল বস্তুর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নেই—এই কথাটি আপনি এই মুহূর্তে মেনে নিন। এতে কোনও সময় লাগার ব্যাপার নেই।

সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করলে ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে কোনও বৈলক্ষণ হলো কিনা তা আপনাদের দেখতে হবে না। কৃষকেরা লাঙ্গল চালায়, বীজ পোঁতার পর বলে যে ক্ষেতের কাজ শেষ, যদিও ফসল ফলতে তখনও দেরি থাকে। কিন্তু ক্ষেতের কাজ হয়ে গিয়েছে এতে কোনও সন্দেহ থাকে না। তেমনই আপনারা যদি মেনে নেন যে সংসারের সঙ্গে আপনাদের সম্বন্ধ নেই তাহলে মনে করুন যে ক্ষেতের কাজ হয়ে গিয়েছে। এখন মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের উপর এর কী প্রভাব পড়ল সেদিকে তাকাবেন না। প্রভাব অনুভূত না হবার কারণ হলো আপনারা মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই প্রভাবকে দেখতে চান আর চান মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তা দেখতে। আমি বলছি যে আপনারা এইদিকে দৃষ্টি দেবেন না। যা চিরকাল থাকবে তার দিকেই আপনারা দৃষ্টি দিন। কতই না সহজ কথা! কত বড় কথা! এর জন্য কোনও অভ্যাস করতে হয় না। সহজ-কঠিন, ভাল-মন্দ সবকিছু মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ে অবস্থিত। এগুলি পরিবর্তনশীল। এগুলি থেকে যা ভিন্ন তা তো যেমনকার তেমনই থাকে। এইজন্য মন-বুদ্ধি প্রভৃতির লক্ষণ একেবারেই দেখবেন না। নিজের অর্থাৎ স্বরূপে কখনও পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তনশীলের দিকে দৃষ্টি দেবেন না। তাকে পরোয়া করবেন না। চিরস্থায়ী নিজের স্বরূপকে দেখুন। তাহলে মুক্তি স্বতঃসিদ্ধ।

❁ ❁ ❁

(১২) ভগবৎ প্রাপ্তি সহজ

আমরা করলে তবেই কাজটি হবে—ক্রিয়ার এইরকম একটি বিষয় আছে। কৃষি করলে তবে হবে, ব্যবসা করলে তবে হবে, চাকরী করলে তবে হবে—এইভাবে একটি ধারণা আছে যে কিছু করলে তবেই কাজটি হয়। তেমনই ভগবৎ প্রাপ্তিও কাজ করলে হবে এবং ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য যতটা সময়, শক্তি, বুদ্ধি নিযুক্ত করব, যতটা প্রয়াস করব আমরা ততটাই ভগবানের কাছে পৌঁছাব এবং এইভাবে করতে করতে ভগবানকে পেয়ে যাব—এইরকম একটি ধারণা আছে। তবে এতে একটি মার্মিক কথা জানার প্রয়োজন। তা হলো পরমাত্মা আগে থেকেই আছেন। আমরাও সেই পরমাত্মার কাছেই আছি। পরমাত্মা দূরে আছেন, অতএব ধীরে অথবা দ্রুততার সঙ্গে গিয়ে সেখানে পৌঁছাব, পরিশ্রমও হবে, পথও অতিক্রান্ত হবে, সময়ও ব্যয় হবে—এমন কোনও কথা নেই। যেখানে আমরা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে চাই এবং যেখানে আমরা নিজেদের অবস্থান মেনে নিই—সেখানে পরমাত্মা সম্পূর্ণরূপে বিরাজিত।

অপরের পরমাত্মাকে পাইয়ে দেবার অধিকার, তিনি অন্য কারও কব্জার মধ্যে রয়েছেন, তিনি ছাড়াবেন তবেই কাজ হবে, তাঁর জন্য অপরের কাছে গরজ দেখাবেন তাহলে তিনিই ব্যবস্থা করবেন আর তবেই তাঁকে পাওয়া যাবে—মোটেই এমন কথা নয়। পরমাত্মা কারও অধিকারে নেই, তিনি কারও কব্জায় নেই, তিনি কোনও স্থানে বন্দী নন। তিনি কোনও জ্ঞান প্রভৃতির দ্বারা বাঁধা নন। তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর উপর আমাদের পূর্ণ অধিকার, কেননা আমরা তাঁর অংশ—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫/৭), **'ঈশ্বর অংস জীব অবিনাশী'** (মানস ৭/১১৭/১)। যেমন, মায়ের কোলে যাবার জন্য শিশুকে কী কী কাজ করতে হয়? তার জন্য কি চেষ্টা করতে হয়? তাকে কি শুদ্ধ হতে হয়? তাকে কি বিদ্বান, বলবান বা ধনবান হতে হয়? তিনি যে মা, যেমন তেমন করেই মায়ের কাছে

যাওয়া যেতে পারে। ভগবান তো মায়ের চেয়েও বেশি আপন এবং বেশি নিকটে। কেননা মা তো এক জন্মের আর ভগবান চিরকাল আমার। ভগবান তো চিরকাল আমাদের মা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন। আমাদের নিকটতম বস্তুই হলেন ভগবান। তিনি শরীরের থেকেও বেশি কাছে, কেননা শরীর পরিবর্তনশীল, পরিবর্তনশীল বলে আমাদের থেকে আলাদা। শরীরের ঐক্য সংসারের সঙ্গে এবং আমাদের ঐক্য ভগবানের সঙ্গে। এইজন্য তাঁকে পেতে সময়, বল, বুদ্ধি লাগাতে হবে—এমন কথা নয়। কেবল সেদিকে আমাদের দৃষ্টি নেই। আমাদের দৃষ্টি আছে বিনাশশীল পদার্থের দিকে। বিনাশশীল পদার্থগুলির মধ্যেও পরমাত্মা যেমনকার তেমনভাবে পরিপূর্ণ। কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি না থাকায় তিনি দৃষ্ট হন না। বিনাশশীল পদার্থগুলিই কেবল দেখা যায়। যেমন, আমরা ট্রেনে করে যাচ্ছি, কোনও স্টেশনে ট্রেন থামল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, কেননা সামনে আর একটা ট্রেন আসছে। সামনের দিক থেকে ট্রেন এল এবং অন্য লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা সেই ট্রেনের দিকে তাকালাম। সেই ট্রেন চলতে শুরু করলে মনে হয় যে আমাদের ট্রেনটাই বোধহয় চলছে। কিন্তু বাস্তবে আমাদের ট্রেন তো দাঁড়িয়ে আছে। যখন আমরা স্টেশনের দিকে তাকাই তখন এটি বুঝতে পারি। এইভাবেই চলিষ্ণু সংসারের দিকে না তাকিয়ে স্থির পরমাত্মাকে দেখুন। সেই পরমাত্মা কোথাও থেকে আসেননি, আর কোথাও যাননি। তিনি যেমনকার তেমনই আছেন। সংসার তো চলিষ্ণু।

জাগতিক বস্তুগুলি আমাদের কাছে নেই, তাই সেগুলি পেতে সময় লাগবে। সেজন্য সেই বস্তুগুলির কাছে আমাদের যেতে হবে অথবা সেগুলিকে আমাদের কাছে নিয়ে আসতে হবে। সেগুলির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে হবে অথবা সেগুলিকে তৈরি করতে হবে। এইসব করলে তবেই সেই বস্তু পাওয়া যাবে। এই নিয়ম হলো জাগতিক বিষয়ের জন্য, পরমাত্মার জন্য এই নিয়ম নয়। যা সদা সর্বদা হাজির তাকেই পেতে হবে। কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি না থাকায় তাঁকে দূরবর্তী বলে মনে হয়, তার এবং

আমাদের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে বলে মনে হয়। তার কারণ বিনাশশীল বস্তুর দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে।

এখন এটি মেনে নিন যে পরমাত্মা সকল দেশে, সকল কালে, সকল বস্তুতে এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে অবস্থিত রয়েছেন। শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নিজেদের নয়। এই সবই পরমাত্মার। যা নিজেদের নয়, তাকে নিজেদের বলে মেনে নিলে যা নিজেদের তাকে নিজেদের বলে মনে হয় না।

গীতায় ভগবান বলেছেন—'**যো মাং পশ্যতি সর্বত্র**' (গীতা ৬/৩০) 'যে আমাকে সর্বত্র দেখতে পায়' এবং **ময়া ততমিদং সর্বম্**' (গীতা ৯/৪) 'এই যেটি দৃষ্ট তাতে আমি আছি' তথা '**ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি**' (গীতা ১৮/৬১) 'আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে বিরাজমান' এবং '**সর্বস্ব চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ**' (গীতা ১৫/১৫) 'আমি সকলের হৃদয়ে সম্পূর্ণ ও ভালভাবে প্রবিষ্ট'। জানার যোগ্য এই তত্ত্ব হৃদয়ে বিরাজমান—**হৃদি সর্বস্ব বিষ্ঠিতম্**' (গীতা ১৩/১৭)।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, পুরুষ, পণ্ডিত, মূর্খ, পশু, পাখি—যা কিছুই হোক না কেন পরমাত্মা সকলের মধ্যেই আছেন। সেই পরমাত্মা সকলের এবং তিনি পরম সুহৃদ—'**সুহৃদং সর্বভূতানাম্**' (গীতা ৫/২৯)। একটি বিশেষ কথা হলো, সেই পরমাত্মা সকলকে নিরন্তর নিজের দিকে আকর্ষণ করছেন, সকলকে ডাকছেন। এটি কি করে জানা যাবে? এটি এইভাবেই জানা যায় যে কোনও পরিস্থিতি; অবস্থাতেই তিনি আপনাদের টিকে থাকতে দেন না। আপনি যে কোনও গোষ্ঠীতে থাকুন, যে কোনও বস্তুর সঙ্গে আপনারা নিজেদের সম্বন্ধ যুক্ত করুন—তা থাকবে না। ভগবান কারও সঙ্গেই আপনাদের টিকে থাকতে দেন না। কেননা আপনারা এঁদের সাথী নন, এবং এঁরা আপনাদের সাথী নন। বাল্যাবস্থা চলে গেলে আমরা যৌবনাবস্থাকে আঁকড়ে ধরি, যৌবন চলে গেলে বৃদ্ধাবস্থাকে ধরে নিই। আপনারা ধরেন আর ভগবান ছাড়ান। এটি হলো ভগবানের ক্রিয়াত্মক উপদেশ। এক, কিছু বলে জানানো এবং দুই হলো, কিছু করে

জানানো। তাই তিনি শাস্ত্রের মাধ্যমে, সন্তদের মাধ্যমে বলেন এবং যা করেন তা হলো আপনাদের কারও সঙ্গে টিকতে দেন না। যেন বলতে চাইছেন, আমার দিকেই এসো, আর কোথাও থেকো না, আর কাউকে নিজের মনে কোরো না; কেননা বাস্তবে এরা কেউ তোমাদের নয়, আমি তোমাদের আর তোমরা আমার।

প্রশ্ন—যা দৃষ্ট হয় পরমাত্মা তাতেই আছেন, নাকি যা দৃষ্ট হয় সেইটিই পরমাত্মা? দুটির মধ্যে কোনটি ঠিক?

উত্তর—দুটিই ঠিক। দেখুন, যদি প্রকৃতি এবং পুরুষ (পরমাত্মা এবং তাঁর শক্তি)—এই দুটিকে মেনে নেন তাহলে সংসারে পরমাত্মা আছেন। আর এক পরমাত্মাকেই যদি মানেন তাহলে তো পরমাত্মাই আছেন। উভয় সাধনার মধ্যে কোনটি সহজতর—এটি সাধকের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তাঁর যদি এই ধারণা থাকে যে সবকিছুই পরমাত্মা তো ঠিক আছে। কিন্তু সকলের পক্ষে এটি শক্ত; কেননা যা দৃষ্ট হয় তা তো বদলাতে থাকে। কিন্তু পরমাত্মা তো বদলান না। তাহলে পরিবর্তনশীল বস্তু কি করে পরমাত্মা হবেন? এইরকম সংশয় হতে পারে। এইজন্য সবকিছুতে পরমাত্মা আছেন—এতে সংশয় কম হয়। এইগুলি দুটি কথা নয়—চারটি কথা। সংসারে পরমাত্মাকে মানুন কিংবা পরমাত্মাকে সংসারে মানুন ; অথবা সংসারকেই পরমাত্মা বলে মানুন কিংবা এই সংসার পরমাত্মার বলে মানুন—সবকিছুর পরিণাম এক। সবকিছুর মধ্যে পরমাত্মা আছেন—এটিই সহজ। তার চেয়েও সহজ হলো এই কথা যে সমগ্র সংসার পরমাত্মার, এর মালিক পরমাত্মা। এইটি মেনে নিয়ে সকলের সেবা করুন। আসল কথা হলো লক্ষ্য পরমাত্মার প্রাপ্তি হওয়া চাই, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

❁ ❁ ❁

(১৩) আমাদের স্বরূপ হলো সচ্চিদানন্দ

'আমি আছি'—এই কথাটি যে আপনারা মনে করেন সেই বিষয়ে একটি বিশেষ কথা আপনারা মন দিয়ে শুনুন। আপনারা এককভাবে যখন 'আমি আছি' এটি মনে করেন তখন এই 'আছি'-ত্ব একদেশীয় হয় আর 'সে আছে' 'এটা আছে' 'ওটা আছে' এই 'আছে'-ত্ব, ব্যাপক। এই 'আছে'-ই তো 'আমিত্ব' কে ধরে 'আছি' হয়েছে। 'আমি' যদি না থাকি তাহলে কেবল 'আছে'-ই থাকবে। এই 'আমি'-ও তখন হয় যখন কোনও কামনা হয়। মানুষ কিছু করতে চায়, জানতে চায়, পেতে চায়। কিছু-না কিছুর কামনা হওয়ার ফলেই 'আমিত্ব' হয়ে থাকে। যদি কোনও কিছুর কামনা না থাকে, তাহলে কেবল 'আছে'-ই থাকবে।

আপনারা অনাদিকাল থেকে 'আছি'-তে (যা নেই) নিজেদের স্থিতি মেনে রেখেছেন। 'আছে'তে স্থিতি হলে আর 'আছি' থাকে না। এর এত মহিমার কথা আমি পড়েছি যে একবার যে 'আছে'-তে স্থিত হয়ে গিয়েছে তার জানার, করার, পাবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন হয় না। ঐ 'আছে'-তে স্থিত হয়ে গেলে কিছু করবার থাকে না, জানার থাকে না, পাবার থাকে না। কিছুই থাকে না। কেবল 'আছে'-ই থাকে। সেখানে পূর্ণতা থাকে। যতক্ষণ 'নেই' থাকে ততক্ষণ পূর্ণতা থাকে না। পূর্ণতাতে আংশিকরূপেও 'নেই' থাকে না। তাই একবার 'আছে'-তে স্থিত হয়ে গেলে আর কখনও 'আছি' আসবে না। 'আছি'-ত্ব যে পুরাতন সংস্কার তা বুদ্ধিতে স্ফূরিত হতে পারে, কিন্তু 'আছে'-তে 'আছি' থাকে না। মন-বুদ্ধিতে এইজন্যই আসে যে মন-বুদ্ধি তার সঙ্গে ছিল, তাই যেমন কোনও পুরাতন কথা মনে পড়ে যায় তেমনি 'আছি' এসে যায়। বাস্তবে অবশ্য 'আছি'-র অস্তিত্ব নেই তাহলে আসবে কি করে? যা স্মৃতিতে আসে তা বাস্তবে নেই। কেবল আগে দেখা, শোনা, ভোগ করা বস্তুই স্মৃতিতে আসে, বস্তু আসে না। এইরকম 'আছি' স্মৃতিতে আসে, বাস্তবে নেই, ঐ 'আছে'-তেই সকলের স্থিতি।

এখন একটি বিশেষ কথা বলা হচ্ছে। মন দিয়ে শুনুন। সেটি এই যে বাস্তবে আমরা কী চাই? সেদিকে দৃষ্টি দিন। বিভিন্ন রকমের চাওয়া (কামনা) থাকার জন্য মানুষ বাস্তবে কী চায় তা ভুলে গিয়েছে। কিন্তু ভুলে গেলেও ভোলে না। তা সবসময় মনে থাকে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে ঠিক উত্তর দিতে পারে না। কেননা সে এখনও এই বিষয়ে চিন্তা করেনি। যদি চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন যে আমি চিরকাল থাকতে চাই। কোনও মানুষই চায় না যে সে শেষ হয়ে যাক। কখনও দুঃখে পড়ে এরকম বলে যে মরে গেলে বেঁচে যাব। সে শরীরকে দুঃখের কারণ বলে মনে করে, তাই দুঃখ দূর করতে শরীরের অবসান চেয়ে বলে যে তাতেই আমি সুখী হব, তাহলে আমি থাকি এবং সুখী থাকি—এই ইচ্ছাটি থেকেই যায়। ধন, সম্পদ, বৈভব, মান, সম্মান, আরোগ্য প্রভৃতি যা চাওয়া এগুলি আসলে আমাদের চাওয়া নয়। আমাদের চাওয়া তো চিরকাল থাকার, আর চিরকাল থাকার নাম হলো 'আছে'। যা নিত্য নিরন্তর থাকে তাকে 'আছে' বলা হয়, সেই 'আছে' তে স্থিত হলে আমাদের নিত্য-নিরন্তর থেকে যাওয়ার চাহিদা পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু যদি অন্য কিছু চাওয়া হয় তাহলে 'আছে' থেকে ভিন্ন হয়ে যায়; কেননা এখন যা নেই তাকে পাওয়ার ইচ্ছা হলো 'না'-কে চাওয়া। 'না'-কে ধরলেই চাওয়া হয়। যদি না-কে ধরা না হয় তাহলে 'আছে'-তো যেমনকার তেমনই থেকে যাবে।

'না'-কেই সবসময় চাওয়া হয়। 'আছে'-ত্ব তো সবসময় থাকে, কখনও দূর হয় না। যে অংশে 'আছে' থেকে বিমুখ হন সেই অংশে 'না'-কে চাইতে থাকেন। চাওয়ার দ্বারাই সেই অংশে 'আছে, থেকে ভিন্ন হয়ে যান, নইলে 'আছে' থেকে ভিন্ন হবার সামর্থ্য কারও নেই। চাইলেও তো নিজস্বতা মেনেই থাকেন। 'না'-কে চাওয়া দূর করে দিন, তাহলে 'আছে'-তে স্থিতি স্বতঃসিদ্ধ।

আমরা জ্ঞান চাই, জানতে চাই। এই জানাটিও 'আছে'-তে স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু 'না'-কে ধরে রাখলে জানবার ইচ্ছা তৈরি হয়। যদি 'না'-কে না ধরেন, তাহলে জানবার ইচ্ছাও দূর হয়ে যাবে। আমরা কী চাই? আমরা

দুঃখিত হতে চাই না। 'আছে'-তে দুঃখ একেবারেই নেই, জ্ঞানেতেও দুঃখ নেই। কোনও বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হলে আপনা থেকেই এক শান্তি, এক সুখ অনুভূত হয়, কেননা জ্ঞান আনন্দস্বরূপ।

আমাদের চাওয়া এই প্রকারের—সৎ, চিৎ এবং আনন্দের প্রাপ্তি যা স্বতঃই নিজস্বতায় রয়েছে। যার অবসান হয় তাকে 'অসৎ' বলে, যার কখনও অবসান হয় না তাকে 'সৎ' বলে। যার মধ্যে জ্ঞান নেই তাকে জড় বলে। যার মধ্যেই জ্ঞান আছে তা চেতন। যেখানে কখনও দুঃখ আসে না তাই হলো আনন্দ। এই সৎ, চিৎ এবং আনন্দ তো সকলে স্বতঃই প্রাপ্ত হয়েছে। আমাদের স্বরূপ হলো সচ্চিদানন্দ। যখনই উৎপাদনশীল এবং বিনাশশীল বস্তুকে গ্রহণ করেন তখনই বন্ধন হয়। যা উৎপন্ন হয় এবং যার বিনাশ আছে সেটি আপনার স্বরূপ নয়, তাকে ধরে রাখাতেই দুঃখ। ধন নেই, পুত্র নেই, গৃহ নেই—এইভাবে কয়েক প্রকারের না, না-কে ধরে রেখেছেন, তাই নিজেদের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের অনুভূতি হচ্ছে না।

প্রশ্ন—নিজের স্বরূপ 'আছে'-তে স্থিতি হয়ে যাবার পরও কি পুরাতন সংস্কার আসে?

উত্তর—পুরাতন সংস্কার 'আছে'-তে আসে না, মন-বুদ্ধিতে আসে। সংস্কার তো মন-বুদ্ধিতেই পড়ে থাকে কিন্তু সেগুলিকে নিজস্বতায় মেনে নেন। অনন্তকাল ধরে মন বুদ্ধিতে আগেও সংস্কারকে নিজস্বতায় মেনে আসছেন, কিন্তু এইগুলি নিজস্বতায় আসে না। কারণ এইগুলি আসে এবং যায়—আর 'স্বয়ং' তো থাকে। আসা-যাওয়ার প্রবেশ তো মন-বুদ্ধিতে হতে পারে। কিন্তু 'আছে'-তে 'না'-র প্রবেশ কি করে হতে পারে? আপনারা কেবল না-কে ভুলবশত নিজস্ব মেনে নিয়ে তার সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়ে নেন।

স্বরূপে আকর্ষণ-বিকর্ষণ একেবারেই নেই। এগুলি তো মন-বুদ্ধিতে আছে। একটু মন দিলেই আকর্ষণ এবং বিকর্ষণকে কোনও জ্ঞানের অন্তর্গত বলে প্রতীত হবে। তাহলে এই দুটি সেই জ্ঞানের মধ্যে কোথায় আছে? যেমন, আলোতে হাত দেখা যায়, কিন্তু হাতে তো আলো নেই বরং

আলোর মধ্যেই হাত আছে। সেইরকম মন-বুদ্ধিতে হওয়া আকর্ষণ-বিকর্ষণ জ্ঞানের অন্তর্গত। জ্ঞানই বলুন আর 'আছে' বলুন—একই কথা। তার মধ্যে আপনার স্থিতি স্বাভাবিক।

প্রশ্ন—যতদিন এই শরীর আছে ততদিন কি অন্তঃকরণে এইসব বিকার হতেই থাকবে?

উত্তর—না, মোটেই নয়। শরীর থাকার সঙ্গে অন্তঃকরণের বিকারের কোনও সম্পর্ক নেই। অসৎ-কে সৎ মনে করলে, 'আছে'-কে না মানলে অন্তঃকরণে বিকার থাকে। অসৎ-কে সৎ মনে করেছ কি বিকার আসবে। অসৎ-কে সৎ মনে না করলে শরীর থাকলেও বিকার আসবে না। শরীরের বৃদ্ধ হওয়া, দুর্বল হওয়া প্রভৃতি বিকার তো অবস্থানুসারে স্বতঃ স্বাভাবিক, কিন্তু আকর্ষণ বিকর্ষণ প্রভৃতি যে বিকার সেগুলি হবে না। অ-সতের প্রতি সৎ-বুদ্ধি হলেই এগুলি হয়ে থাকে। ভাল করে চিন্তা করুন। অসৎ অসৎ-ই আর সৎ সৎ-ই। আপনারা 'আছে'-তে স্বাভাবিকভাবে স্থিত, স্থিতি না মানার জন্যই স্থিত হতে হয়। আগে থেকেই যাতে স্থিত আছেন তাতে আর স্থিত হবার কী আছে? আপনারা 'আছে'-তে স্বতঃই স্থিত, সেইজন্যই আসা-যাওয়া প্রতীত হয়।

কোন ব্যক্তি কোন পরিস্থিতিতে কী ধরনের চেষ্টা করেছেন তা তিনি ছাড়া আর কেউ জানতে পারেন না? এইজন্য কারও প্রতি আক্ষেপ না করে সত্য নির্ণয় করা উচিত। অন্যকে সামনে রেখে সত্য নির্ণয় কখনও হতে পারে না। নিজেকেই সামনে রাখুন। যদি অপরকে আদর্শ করতে হয়, তাহলে শুভ কাজে নিন, অশুভ কাজে নেবেন না।

(১৪) দৃশ্যমান সবই অদৃশ্যে চলে যাচ্ছে

একটি খুবই সোজা কথা। সেটিকে ভাল করে বুঝে নিলে সাধনা খুবই সহজভাবে শুরু হয়ে যাবে। যেমন, গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে এটি যদি

জেনে এবং মেনে নেওয়া যায় তাহলে প্রবাহ আছে কিনা তা নিয়ে কখনই সংশয় দেখা দেবে না। গঙ্গার প্রবাহের মতো সংসারের প্রবাহও চলছে। এই সারা সংসার নিরন্তর অদৃশ্যের দিকেই যাচ্ছে। যা দেখা যাচ্ছে তা প্রতিমুহূর্তে না দেখায় চলে যাচ্ছে। কাল যেটিকে দেখা গিয়েছে আজ তা দেখা যাচ্ছে না। একটু চিন্তা করে দেখুন কাল যা শরীর ছিল, আজ তা নেই, প্রতি- মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে। এইভাবে দৃশ্য প্রতিমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সহজ সরল কথা। শিখে নেওয়ার দরকার নেই। হয় মানুন, না হয় জেনে নিন, এই সবই চলে যাচ্ছে। এতে যদি কোনও সন্দেহ থাকে তো বলুন। যেদিন কেউ মারা যান তো বলেন যে লোকটি আজ মারা গেল, কিন্তু বাস্তবে যেদিন সে জন্মেছিল সেদিন থেকেই তার মৃত্যু শুরু হয়ে গিয়েছিল, আজ সেটি পূর্ণ হলো।

এখন যে অবস্থা তা প্রতিক্ষণ চলে যাচ্ছে। ধনমান এবং দারিদ্র্য, শ্রদ্ধা এবং অশ্রদ্ধা, মান এবং অপমান, শক্তিমত্তা এবং দুর্বলতা, ব্যাধিগ্রস্তা এবং নীরোগ প্রভৃতি সব অবস্থাই চলে যাচ্ছে। এতে খুশি অ-খুশি হওয়ার কী আছে? এটি বুঝে নেওয়ার পর এতে দৃঢ়নিশ্চয় থাকুন। কেউ যদি এখন এসে বলে অমুক লোকটি মারা গিয়েছে তাহলে মনের ভিতরে যেন এই ভাবটি থাকে যে এ আর নতুন কথা কী? এতো তাই যা প্রতিমুহূর্তে হয়ে চলেছে। এতে যদি নতুন কিছু মনে হয় তা হলো এই যে দৃশ্য সবসময় অদৃশ্যে চলে যাচ্ছে তার দিকে দৃষ্টি নেই। তাই মৃত্যু সংবাদে চিন্তা হয়, দুঃখ হয়। এটি তো মৃত্যুলোক, মরণশীলদেরই লোক, এখানে সবাই মারা যাবে। মৃত্যু ছাড়া আর আছে কী? যা প্রত্যক্ষ তা সবই অবিদ্যমানতায় চলে যাচ্ছে। এই কথাটি ভাল করে জেনে নিন। যা জীবন তা মৃত্যুতে চলে যাচ্ছে। আজ পর্যন্ত যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন আয়ুর মৃত্যুই হয়েছে; বেঁচে ছিলেন এটিতো ভুল, আর মৃত্যু হয়েছে সেইটিই ঠিক কথা। এই কথাটিকে ঠিকমতো বুঝতে হবে, মুখস্থ করে রাখতে হবে না।

এখন বলবেন যে যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মৃত্যুর ক্রিয়া দেখা যায়নি। চিন্তা করুন যে কালো চুল না মারা গেলে আজ সাদা চুল কি করে

হলো? আপনারা বলবেন যে রূপান্তরিত হয়েছে। মৃত্যুতে আর কী হয়? রূপান্তরই তো হয়। আগে যেমন প্রাণশক্তি মনে হোত এখন তেমন দেখায় না। অর্ধেক বয়স চলে গিয়েছে, মানে অর্ধেক মৃত্যু হয়েছে। অর্ধেক বয়স চলে গিয়েছে এই কথা তো আপনারা মানেন কিন্তু অর্ধেক মৃত্যু হয়েছে এটি আপনারা বোঝেন না, কিন্তু বাস্তবে একই কথা। কেবল শব্দেই ভিন্নতা, ভাবে একেবারেই ভিন্নতা নেই। শুনতে খারাপ লাগে, তার কারণ বেঁচে থাকার ইচ্ছা। কিন্তু কথাটি সত্য। অর্ধেক বয়স চলে গিয়েছে, যদি এই জ্ঞান মনে গেঁথে থাকে তাহলে উপলব্ধ সেই জ্ঞানকেই আমি দৃঢ় করে দিচ্ছি। এইটুকুই আমার কাজ। আমি কোনও নতুন কথা শেখাই না। উপায় হলো তিনটি— শেখা, মানা ও জানা। এটিকে পাকা বলে মানুন, জানুন—এইটুকুই আমার কথা। এরপর এটি চিরজাগরুক থাকবে, তাতে সন্দেহ হবে না। এতটা বয়স পার হয়ে গিয়েছে এতে কি সন্দেহ হয়? সন্দেহ যদি না হয় তাহলে ততটাই মৃত্যু হয়েছে, এতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? শরীর সবসময়ে চলে যাচ্ছে, এটি একেবারেই সত্য কথা।

আমি আমার অতীত কথা বলছি। যেদিন আমি বুঝলাম যে এই দৃশ্য অদৃশ্যে চলে যাচ্ছে সেদিন আমার এতই আনন্দ হলো—আহা! কী মার্মিক কথা। কী উত্তম কথা? আমি প্রবঞ্চনা করছি না, মিথ্যা কথা বলছি না, আপনারা একটু মন দিন, শরীর মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে, নাকি বেঁচে থাকার দিকে? মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে। এইটিই প্রকৃত সত্য। দৃশ্য অদৃশ্যের দিকে যাচ্ছে—মানেই হলো তা মৃত্যুর দিকে যাচ্ছে। আমার মনে হলো, বালকেরা যখন পড়ার সময় একবার ক খ গ ঘ শিখে নেয় তো তার তা মুখস্থ হয়ে যায়। তখন তাকে প্রশ্ন করলে সে তৎক্ষণাৎ বলে দেবে। মনে করতে হবে না, তেমনি আপনারাও চলতে ফিরতে সবসময় স্মরণ করুন যে এই সবই চলে যাচ্ছে। দৃশ্য অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ভাব অভাবে চলে যাচ্ছে। জীবন মৃত্যুতে চলে যাচ্ছে। দর্শন অদর্শনে চলে যাচ্ছে। এইভাবে একে যদি সবসময় মনে রাখেন তাহলে নিজে থেকেই এর প্রভাব পড়বে আর তাতে খুব লাভ হবে। এই পাঠকে বালকের মতো শিখে নিন, যতটা সুখের প্রতি

লোভ, বেঁচে থাকার প্রতি লোভ এই কথার প্রতি ততটা শ্রদ্ধা নেই। লোভ এবং শ্রদ্ধা দুটি জিনিস। এই কথায় শ্রদ্ধা কম, লোভের প্রতি শ্রদ্ধা বেশি। শ্রদ্ধা কম, ভুল তো সেখানেই। তাহলে আজ থেকে এই কথাকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করুন।

(১৫) সংযোগে বিয়োগের অনুভূতি

একটি বিশেষ লাভজনক এবং খুবই সহজ সরল কথা আছে। ইচ্ছা তিন রকমের—বাঁচার ইচ্ছা, করার ইচ্ছা এবং পাওয়ার ইচ্ছা। এই তিনটি ইচ্ছা যত প্রবল হবে সংসারে ততই বন্ধন হবে এবং প্রকৃত তত্ত্বকে বুঝতে ততই বাধা হবে। ইচ্ছা যদি দূর হয় তাহলে কাজ খুবই সোজা হয়ে যাবে।

কাল যে কথা বলেছিলাম, এই বাঁচার ইচ্ছাই তাঁকে বুঝতে দেয় না। এই ইচ্ছার দ্বারা কিছুই পাওয়া যায় না, এতে কোনও লাভ নেই। লোকসান ছাড়া আর কিছু নেই। যত বছর বয়স হলো তত বছর মৃত্যু আমার হয়ে গিয়েছে—এই কথাটি বেঁচে থাকার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় বোঝা যায় না। সিকি ভাগ বয়স যদি চলে গিয়ে থাকে তাহলে আমি সিকি ভাগ মরে গিয়েছি, অর্ধেক বয়স যদি চলে গিয়ে থাকে তাহলে অর্ধেক মরে গিয়েছি আর যখন সম্পূর্ণ বয়স চলে যাবে তখন সমস্তটাই মরে যাব। তাহলে এতে সংশয় কোথায়? যেমন, সরোবরে জল আসে, সেই জল চলে গেলে বলা হয় যে জল শেষ হয়ে গিয়েছে। তেমনই মানুষ যখন মারা যায় তখন বলা হয় যে 'শেষ হয়ে গিয়েছে'। জল যেদিন ভরেছিল সেদিন শেষ হয়নি। তা কমতে কমতে শেষ হয়ে গিয়েছে। জল তো নিরন্তর শেষ হয়ে যাচ্ছিল। আর এক - দিন সবটাই শেষ হয়ে গেল। মানুষও এমন করে নিরন্তর শেষ হতে থাকে। এখন এতে নতুন কথা কী আছে? এই সমগ্র জগৎও শেষ হচ্ছে, সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

মহাভারতের বনপর্বে যক্ষ এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন

আছে। সেখানে যক্ষ প্রশ্ন করেছিলেন যে আশ্চর্যের কথা কোনটি? মহারাজ যুধিষ্ঠির এর উত্তর দিয়েছিলেন।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তীহ যমালয়ম্।
শেষাঃ স্থাবরমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্।।

(মহা. বন. ৩১৩/১১৬)

জগতে প্রতিদিন জীব যমলোকে যাচ্ছে। তবু এখানে জীবিত লোকেরা চিরকাল বেঁচে থাকার ইচ্ছা করেন। এর চেয়ে বড় আশ্চর্য আর কী হতে পারে? '**অহন্যহনি**' অর্থাৎ প্রতিদিনই প্রাণী যমলোকে যাচ্ছে। প্রত্যেক দিন কেমন করে? যেদিন জন্মেছে সেইদিন থেকে যমলোক ক্রমশ কাছে এসে যাচ্ছে। যতগুলি দিন পার হয়ে গিয়েছে বয়স ততদিন কমে গিয়েছে এবং মৃত্যু কাছে এসে গিয়েছে। এতে কোনও সন্দেহ নেই। দর্শন প্রতিদিন অদর্শনে চলে যাচ্ছে। একদিন শেষ হয়ে গেলে দেখা যাবে না। জগৎ প্রতিদিন 'নাস্তি'-তে চলে যাচ্ছে। যদি বর্তমানেই সবকিছুকে নাস্তিতে মেনে নেন তাহলে বর্তমানেই তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার, ব্রহ্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, মুক্তি, আত্মসাক্ষাৎকার হয়ে যাবে।

মরণশীলের সম্বন্ধ নিজের সঙ্গে নেই। আমরা তো অমর—'**ঈশ্বর অংস জীব অবিনাসী।**' অনাদিকাল থেকে আমরা সেই একই আছি আর শরীর উৎপন্ন হওয়ার পর থেকে নষ্ট হয়ে যায়। তাই শরীর থাকতেই তার সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদকে যেন আমরা মেনে নিই। তাহলে পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের অবস্থানের অনুভূতি নিজে থেকেই হয়ে যাবে। যার সঙ্গে বিচ্ছেদ হচ্ছে এবং যার সঙ্গে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, তার সঙ্গে সংযোগ থাকতে থাকতে তার সঙ্গে বিচ্ছেদ যেন এখনই মেনে নিই যে তার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্বন্ধ নেই।

অত্যন্ত সাধারণ ঘরের অনুভূতির কথা। ভাই বোন খেলতে খেলতে যখন মারামারি করে তখন মা বলেন, 'আরে মেয়েকে কেন মারছিস, ওতো নিজের ঘরে চলে যাবে'। সে তো এখন ছোট্ট মেয়ে, তার এখনও বিয়ের সম্বন্ধই হয়নি। কিন্তু তার সমন্ধে ধারণা কিরূপ? সে নিজের ঘরে চলে যাবে, এখানে থাকবে না। তেমনই এই শরীররূপী মেয়েও নিজের

ঘরে চলে যাবে, এখানে থাকবে না। তাহলে এই সবকিছুই চলে যাবার, সর্বদা চলেও যাচ্ছে। বিবাহের দিন কাছে আসছে, নাকি? তাকে রওনা করে দেবার দিন এগিয়ে আসছে, নাকি? তাহলে আজকেই মেনে নিন যে এ নিজের নয়। হ্যাঁ, মেয়েকে পালন-পোষণ করুন, তাকে খেতে-পরতে দিন। মেয়ের মতো এই সংসারও চলে যাবে। এর সেবা করো, এই সেবা হবে করার জন্য, নেওয়ার জন্য নয়। মেয়ের ঘর থেকেও কি নেওয়া হয়? মেয়েকে দিতে হয়, নাকি তার কাছ থেকে নিতে হয়, বলুন? সংসারে নেওয়ার ইচ্ছা হলো পাপ। নেওয়ার ইচ্ছা ছেড়ে দিন, তার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যাবে, আপনার মুক্তি হয়ে যাবে। বেঁচে থাকার ইচ্ছার মূল কারণ হলো শরীরের সঙ্গে ঐক্য মেনে নেওয়া। যে সংযোগের প্রতিক্ষণ বিচ্ছেদ হচ্ছে সেই সংযোগের সঙ্গে সদ্ভাব করে নিয়েছেন, তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন—ভুল এখানেই করেছেন, এর জন্যই জন্ম-মৃত্যু হয়ে থাকে।

মৃত্যু ভয়ের মধ্যে খুব সুন্দর তত্ত্ব ভরা আছে। যা স্বয়ং তার মৃত্যু নেই আর যা শরীর তা থাকে না। যে থাকে না তার মৃত্যু ভয় থাকতে পারে না। আর যার মৃত্যু হয় তারও মৃত্যু ভয় হতে পারে না। মন দিয়ে শুনুন, যার সবসময় মৃত্যু হয় সে তো মৃত্যুরূপ। মৃত্যুর মৃত্যুকে কী ভয়? আর যার মৃত্যুই নেই তার মৃত্যুকে কেমন করে ভয় হবে? তাহলে স্বয়ং-এরও মৃত্যু ভয় নেই আর শরীরেরও মৃত্যু ভয় নেই। যে শরীরের নিজে থেকে প্রতিমুহূর্তে বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে আমরা সংযোগকে মেনে নিয়েছি এবং সেই সংযোগের যে সত্তাকে আমরা মেনে নিয়েছি তারই মৃত্যু হচ্ছে। এইটি হলো মৃত্যু ভয়। এর কী উপায়? উপায় হলো—বিচ্ছেদকে মেনে নেওয়া। বিচ্ছেদ প্রতিক্ষণই হচ্ছে, সংযোগ একেবারেই নেই। এরই নাম মুক্তি।

সংযোগের সত্তা মেনে নিয়েছি—এইটিই হলো গাঁট, এইটিই চিৎ-জড় গ্রন্থি, এইটিই বন্ধন। নিরন্তর যার বিচ্ছেদ হচ্ছে তার সংযোগকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন—এটিই হল সকল অনর্থের মূল। বিচ্ছেদরূপী আগুনে এই সংযোগ কাঠের মতো সবসময় জ্বলছে। সুতরাং সংযোগ সত্য নয়, বিচ্ছেদই হলো সত্য। তাই যদি এখনই দৃঢ়তার সঙ্গে এই বিচ্ছেদকে স্বীকার

করে নেন তাহলে এই মুহূর্তেই মুক্তি হয়ে যাবে, কল্যাণ হবে। এতে জোর কী লাগবে? সংযোগকে মেনে নেওয়া হলো বন্ধন আর বিচ্ছেদকে অনুভব করা হলো মুক্তি। বিচ্ছেদকে কে স্বীকার করবে? যে মরতে চায় না, সে। কিন্তু অনুভব করার গরজ নেই, তাই দেরি হচ্ছে। গরজ এইজন্য নেই যে বেঁচে থাকার ইচ্ছা আছে এবং তাতে আছে সংযোগজনিত সুখভোগ এবং সংগ্রহের ইচ্ছা। এইটিই প্রধান বাধা।

এর চেয়ে সূক্ষ্মতর একটি কথা আছে। আমার নিবেদন, আপনারা মন দিয়ে এটি শুনুন। শরীর-সংসারের প্রতিমুহূর্তে বিচ্ছেদ হচ্ছে—এইটি নিশ্চয় করে বসে যান, কিছু চিন্তা করবেন না। আর চিন্তা যদি হয়ও তাহলে তা চলে যাচ্ছে। চলে যাবার প্রবাহেরই নাম হলো চিন্তন। যা চলে যাবে তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধই নেই। এই সবই সদা-সর্বদা চলে যাচ্ছে। আর আমরা এগুলি জানি, আমরা এ থেকে আলাদা। এইভাবেই নিজেদের স্বরূপে থাকুন। দিনে পাঁচ-ছয় বার পনের মিনিট করে এইরকম করুন। তারপর এইটিকে একেবারে ছেড়ে দিন। আর মনে করবেন না, মনে না করলে কথাটা ভিতরে চেপে যাবে। এইটি এমনই বিশেষ কথা, এটিকে সবসময় মনে রাখবার কোনও প্রয়োজন নেই। যদি মনে রাখতে হয় তাহলে পুরোপুরি মনে রাখুন আর যদি ছাড়তে চান তাহলেও পুরোপুরি ছেড়ে দিন। আর মনেই করবেন না। প্রতিদিন যেমন কাজ করেন তেমনভাবে করতে থাকুন, তাহলেই কথাটি একেবারে দৃঢ় হয়ে যাবে। এটি মনে করবার বিষয়ই নয়। এটি কেবল বুঝে নেওয়ার, মেনে নেওয়ার বিষয়। এই যেমন কলকাতা—এটিকে কি আপনারা মুখস্থ করেন? মুখস্থ করলে তো ফেঁসে যাবেন। কেননা মুখস্থ করলে এ সত্তা প্রাপ্ত হবে। দূর করে দিলে এটিকে সত্তা দেওয়া হয়। আমরা একে দূর করতে চাই—এর তাৎপর্য হলো এর সত্তা মেনে নিয়েছি বলেই না একে দূর করতে চাইছি। আমরা যখন এর সত্তাই মানি না তাহলে দূর করব কাকে? অতএব এর অস্তিত্ব স্বীকার করবেন না।

(১৬) স্বভাব সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা

এতরকম বহু কথা মনে আসছে যে সেগুলির একটিতেও যদি মনোনিবেশ করা যায় তাহলে খুবই লাভ হবে। এইরকম অনেকগুলি কথা আছে। সেগুলির মধ্য থেকে একটির উল্লেখ করছি। মানুষেরা প্রায়ই ভজন, স্মরণ, জপ, কীর্তন, সৎসঙ্গ, স্বাধ্যায়, ব্রত পালন প্রভৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এগুলির মধ্যেও ভজন এবং স্মরণকে বেশি গুরুত্ব দেন। ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধের যত মহিমা আছে তত মহিমা আর কিছুতে নেই, এটি খাঁটি কথা। কিন্তু তবুও যতটা লাভ হওয়া উচিত ততটা লাভ হচ্ছে না। তার কারণ কী? তা হলো এই যে মানুষ তার নিজের স্বভাবের সংশোধনের দিকে মন দেয় না। যেমন স্বভাব রয়েছে সেইভাবেই চলে। তাতে কী হবে? যে ভজন-স্মরণ করা হলো তা বৃথা যাবে না, তার বিনাশ হবে না, তবে বর্তমানে জীবন শুদ্ধ, নির্মল, উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না।

স্বভাবের মধ্যে দুটো বড় ব্যাধি আছে—সংগ্রহ করা এবং সুখভোগ করা। এগুলি থেকে স্বার্থপরতা এবং অহঙ্কার এই দুটি বিশেষ দোষ উৎপন্ন হয়। তাতে স্বভাব খুবই খারাপ হয়ে যায়, নিজেরও খারাপ হয় অপরেরও খারাপ করে। সুতরাং যদি পারমার্থিক উন্নতি চান তাহলে স্বভাবের সংস্কার করুন। স্বভাবের সংশোধন খুবই উচ্চ কোটির। আস্তিক ভগবানকে মানেন, নাস্তিক মানেন না। কিন্তু যাঁর স্বভাব সংশোধিত তাঁকে আস্তিক এবং নাস্তিক উভয়েই মানবেন। মানুষ যে কোনও সম্প্রদায়েরই হোন না কেন তাঁর সংশোধিত স্বভাব সকলের ভাল লাগবে। সকলের উপরেই তাঁর প্রভাব পড়বে। যার স্বভাব খারাপ তাকে তার নিজের সম্প্রদায়ের লোকেদেরও ভাল লাগে না। তাহলে আর অন্য সম্প্রদায়ের লোক তাকে কেন সম্মান করবে?

নিজের স্বভাবের সংশোধন করা খুবই প্রয়োজন। ভগবান তো স্পষ্টই বলে দিয়েছেন যে দৈবী-সম্পদ হলো মুক্তির জন্য আর আসুরী-সম্পদ

বন্ধনের জন্য—

'দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।' (গীতা ১৬/৫)

স্বার্থবুদ্ধি, ভোগবুদ্ধি—এগুলি হলো আসুরী স্বভাব। শুধু সিং থাকলেই তাকে অসুর বলা হয় না। যারা স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে টাকা-পয়সার জন্য, ভোগের জন্য অনর্থ করে তারা হলো অসুর। ভগবান গীতায় বলেছেন রাক্ষসী, আসুরী এবং মোহিনী স্বভাবের মানুষেরা তাঁর ভজনা করে না, বরং তাঁকে অবহেলা করে, নিন্দা করে (গীতা ৯/১১-১২)। সেই রাক্ষসী স্বভাববিশিষ্ট যে ক্রোধে অন্যের বিনাশ ঘটায়, আসুরী স্বভাববিশিষ্ট সেই যে নিজের স্বার্থের জন্য, নিজের সুখের জন্য অন্যের বিনাশ ঘটায় এবং সেই হলো মোহিনী স্বভাববিশিষ্ট যে মূঢ়তাবশত বিনা কারণে অন্যকে নাশ করে, তার লোকসান করে। আজকাল আসুরী স্বভাব অনেকের মধ্যে আছে। ক্রোধ তো আসে-যায়, মূঢ়তা সৎসঙ্গের দ্বারা দূর হয় কিন্তু স্বার্থ-দোষ সব সময় থাকে। নিজের শারীরিক সুখ-আরাম এবং আনুকূল্য লাভের ইচ্ছা হলো আসুরী প্রকৃতি। তা সব সময়েই থাকে।

ক্রোধ এবং মূঢ়তা (মোহ) ততটা ক্ষতিকর নয়, স্বার্থ দোষ যতটা ক্ষতিকর। সাধকের পক্ষে স্বার্থবুদ্ধি খুবই ক্ষতিকারক। সাধক ভজন, ধ্যান, স্বাধ্যায় প্রভৃতি তো করতে থাকেন কিন্তু স্বার্থ-দোষ যে এদিকে অনর্থ ঘটায় সেদিকে তাঁর দৃষ্টি যায় না। শরীরের আরাম, ভোগ, সুখ, সংগ্রহের ইচ্ছা এবং যে কোনও রকমে নিজের মতলব সিদ্ধ করার ভাব খুবই ক্ষতি করে। এর ফলে মানুষ উপরে উঠতে পারে না। অতএব সুধীবৃন্দ! নিজেদের স্বভাবের সংশোধন করুন। স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করে অন্যের ভাল করুন, এছাড়া ব্যাধি দূর হবে না।

বর্তমান সময়ে তো স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করা বিশেষ প্রয়োজন। এই স্বার্থের কারণেই মিথ্যা, কপটতা, বেইমানী, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতি কতরকম পাপই তো হচ্ছে, যার কোনও শেষ নেই। যেমন, ক্ষুধার জন্য খাদ্য এবং তৃষ্ণার জন্য জলের প্রয়োজন হয়, তেমনই বর্তমান যুগে স্বার্থত্যাগীদের খুবই প্রয়োজন রয়েছে, এঁদের অভাবে আমদের দেশ আজ

খুবই দুর্দশাগ্রস্ত। সেজন্য কোনও মানুষ যদি একটুও স্বার্থত্যাগ করে অন্যের কল্যাণ করেন তাহলে তিনি খুব শীঘ্রই বিশিষ্টতা লাভ করতে পারেন।

অন্যে কি করে সুখ পাবে? অন্যের লাভ কি করে হবে? অন্যের হিত কি করে হবে?—এই একটি চিন্তা থাকলেই স্বার্থত্যাগ খুব সহজেই হয়ে যায় এবং স্বভাবেরও সংশোধন হয়ে যায়। কিন্তু যিনি নিজের স্বার্থের দৃষ্টিতে অন্যের সুখ বিধান করেন এই উদ্দেশ্যে যে অন্যের উপর তার ভাল প্রভাব পড়বে, অন্যে তাঁকে ভাল মনে করবেন তাহলে তাতে তাঁর স্বভাবের সত্যকার সংশোধন হয় না। এইরকম করা তো সেবা বিক্রি করা। অতএব অন্যের সুখ প্রদান এইভাবে করুন যেন সেও তা জানতে না পারে এবং অন্যেও একেবারেই জানতে না পারে। তবেই স্বভাবের সংশোধন হতে পারে।

মানুষ যে ভাল কাজ করে তার বিনিময়ে সে সুখ-আরাম, মান-সম্মান আশা করে। ভাল কাজ করেই সে অহঙ্কারকে ধরে নেয়। এই অহঙ্কারই হলো সকল আসুরী স্বভাবের মূল কারণ। মহাভারতের নলোপাখ্যানে যেমন বলা হয়েছে যে বহেড়ার ছায়ায় কলিযুগ থাকে : তেমনই অহঙ্কারের ছায়াতে কলিযুগ থাকে। যত দুর্গুণ-দুরাচার আছে সবই আছে এর ছায়াতে। এই অহঙ্কার সকল শুভ কাজকে নষ্ট করে দেয়। আজকাল আমরা প্রতিটি কাজের বিনিময়ে অহঙ্কারেরই আশ্রয় নিয়ে থাকি। দান-ধ্যান করি, ভজন-পূজন করি, জপতপ করি, উপকার করি, সেবা করি—এইসবের দ্বারা অহঙ্কারকেই অর্জন করি, যা হলো আসুরী স্বভাবের মূল। এইটি ত্যাগ করলে স্বভাবের সংশোধন হবে। কোনও কঠিন কাজ নয়। এই ভাবনা যদি দৃঢ় হয় যে অহঙ্কার ত্যাগ করতে হবে, তাহলে তা ত্যাগ হয়ে যাবেই। তা না হলে বেগ পেতে হবে। প্রতিদিন তিন লাখ নামজপ করবেন অন্য সব কাজ করে দেবেন, কিন্তু অহঙ্কার ত্যাগ করবেন না! সাধু হয়ে যাবেন, ত্যাগ করবেন, কিন্তু 'আমি ত্যাগী'—ত্যাগের এই অহঙ্কার যেমনকার তেমন রেখে দেবেন।

অহঙ্কার রাক্ষস মহান্ দুঃখদায়ী সব ভাঁতি।
জো ছুটে ইস দুষ্টসে সোই পাবৈ শান্তি।।

এই অহঙ্কার হলো বড় রাক্ষস। অতএব সুধীবৃন্দ! স্বভাবকে শুদ্ধ করুন, নির্মল করুন। যেটিকে দুর্গুণ-দুরাচার মনে হবে তাকে দূর করে দিন। তাহলেই ভজন-পূজনের বিশেষ প্রভাব পড়বে। এই রাক্ষসগুলি (স্বার্থ এবং অহঙ্কার) সঙ্গে থেকে গিয়েছে বলেই সাধন-ভজনের প্রভাব পড়ে না; সাধককে অসঙ্গ হতে দেয় না। তাই স্বভাবের সংশোধন করার, তাকে শুদ্ধ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

(১৭) সত্য কী

যাই হোক না কেন—আমাদের নিজেদের উদ্ধার করতেই হবে, লোকেদের মধ্যে এই নিশ্চয়ে দৃঢ়তা নেই। এই নিশ্চয় যত শক্তিশালী হবে সংসারে ততই অরুচি হতে থাকবে। সৎসঙ্গে (নিজের উদ্ধারের) পারমার্থিক কথা শুনলে রুচি হয় আর সাংসারিক ভোগে (ভোগ্যবস্তুর প্রতি) অরুচি হয়। এই দুটিকে স্থায়ী করে নিন অর্থাৎ সৎসঙ্গে রুচি এবং ভোগে অরুচি—এই দুটিকে পাকা করে নিন। এটি আপনার কাজ।

সৎসঙ্গে যদি এখন রুচি হয় তাহলে সৎসঙ্গে থেকে ওঠবার সময় স্থির করে নেবেন যে এই কাজটিই করতে হবে। তাহলে তা স্থায়ী হয়ে যাবে। আর এটি যদি স্থায়ী হয়ে যায় তাহলেই সব কাজ হয়ে যাবে। এরূপে নিজের উদ্ধার করা খুবই সহজ, কেবল রুচির প্রয়োজন। মনের মধ্যে একটি কথা জেঁকে বসে আছে যে এই কাজ শীঘ্র হয় না, দেরি হয়। এটি খুবই ঘাতক। পরমাত্মতত্ত্বের জন্য ভবিষ্যতে আশা করা খুবই ঘাতক। ভবিষ্যতের জন্য আশা তো সেই বস্তুতে হয় কর্ম-জাত, যাতে দেশ কালের দূরত্ব থাকে। কিন্তু যা সমস্ত দেশ, কাল, বস্তু, অবস্থা, পরিস্থিতি প্রভৃতিতে পূর্ণরূপে বিরাজমান তার জন্য ভবিষ্যতের প্রশ্ন নেই। সাংসারিক কাজের জন্য যেমন ভবিষ্যতের আশা করা হয় সেইরকম পরমাত্মার ক্ষেত্রেও ভবিষ্যতের এই- রকম আশা করা যে এতে অনেক সময় লাগবে, এটি অতিশয় ভুল ধারণা।

আমি আপনাদের সেই কথাই শোনাই, যা আমার ভাল লাগে, যা থেকে আমি লাভবান হয়েছি। আপনারা যদি এইসব কথার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন তাহলে খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের লাভ হবে। একজন রাজার রাজ্যের বস্তু- সমূহের উপর, সকল গ্রামের উপর যতটা শাসন থাকে সম্বন্ধ থাকে তার চেয়েও বেশি সম্বন্ধ থাকে পরমাত্মার। খুবই বিশেষ কথা হলো এই যে এই- সব বস্তুর সত্তাই পরমাত্মার মধ্যে দৃষ্ট হয়। তা না হলে যে সংসার মুহূর্তের জন্যও থাকে না, তাকে সত্য বলে মনে হবে কেন? এর সঙ্গে পরমাত্মার নিত্য-নিরন্তর সম্বন্ধ আছে, মুহূর্তের জন্যও তাঁর বিয়োগ সম্ভব নয়। তাঁর নিত্যযোগ নিরন্তর বিদ্যমান। সংসারের সংযোগ থেকে বিয়োগের নামই হলো যোগ—**'ত্বং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্'**।। (গীতা ৬/২৩)। এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারের সঙ্গে বিয়োগ মেনে নিলেই যোগ হয়ে যায়। বিয়োগ তো প্রতিমুহূর্তে হচ্ছেই। তাহলে এখনই বিয়োগ অনুভব করে নিন।

সংসারের ভোগে সকলেরই অরুচি হয়। সংসারী লোকেরা সেই অরুচিকে স্থায়ী করে না। ভোগ থেকে যে সুখ পাওয়া যায় সেই রুচিকে স্থায়ী করে, এইখানেই ভুল হয়। সাধককে ভোগের অরুচিকে স্থায়ী করতে হবে।

প্রশ্ন—সংসার থেকে বিয়োগের অনুভূতি হয়ে গেলে তার নশ্বরতার বা অসত্যতার জ্ঞান হয়ে যায়। কিন্তু সত্য কি তা কি করে জানা যাবে? আমরা কি করে জানব যে এটি সত্য-তত্ত্ব?

উত্তর—ভাই দেখুন, আমার মতে সত্যের অভিলাষ কম বলেই তাতে একাগ্রতা নেই। সত্য-এর কথা এত সরল এত ভাল এবং এতই প্রত্যক্ষ যে কী বলব! এখন মন দিন। যার দ্বারা আপনাদের অসত্যের জ্ঞান হয় সেইটিই সত্য। অসত্যের জ্ঞান অসত্যের দ্বারা হয় না। এখন বলুন তো ঐ সত্য কত কাছের!

অনেকের প্রশ্ন হলো, সংসার তো বিনাশশীল, কিন্তু পরমাত্মা অবিনাশী তার ঠিক কী? আরে, অবিনাশী ছাড়া বিনাশশীল দৃষ্টই হয় না। সত্য

ব্যতিরেকে অসত্যের ধারণাই হয় না। অসত্যকে তখনই অসত্য বলে দেখা যায় যখন আপনারা সত্যে স্থিত হন। তাই সত্যে আপনাদের স্থিতি স্বতঃসিদ্ধ। ব্যাস এতে স্থির থাকুন। সত্য কী তা জানি না। প্রাপ্তি কী হয়? তত্ত্বজ্ঞান কাকে বলে? জীবন্মুক্ত কী? কারও কি শিং গজায়, লেজ হয়, ডানা হয়, হয়টা কী? কী জানি এরকম কী সব কল্পনা করে রেখেছেন!

কৃপানাথ! আপনি এইটুকু কৃপা করুন। এইটুকুই কথা যে অসত্যের বোধ যার হয় সেই সত্য। কেউ বলতে পারে, সব দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু চোখকে দেখতে পাচ্ছি না? যার দ্বারা সবকিছু দেখা যায় তাই চোখ। চোখকে কি করে দেখা যাবে যে এটি চোখ? দর্পণে চোখকে দেখতে পেলেও দেখার শক্তি দেখতে পান না। যেখানে সেই শক্তি প্রকাশিত হয় সেই স্থানকে দেখতে পান। পড়ে, শুনে, চিন্তা করে আপনাদের যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞান যার দ্বারা হয় সেইটিই সত্য। এইটিই সকলের প্রকাশক এবং আধার, সেইটিই জ্ঞানস্বরূপ, চেতনস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ।

দর্পণে যেমন মুখ দেখা যায় তেমনি এই সংসার দৃষ্ট হয়। সংসার স্থির থাকে না, পরিবর্তিত হতে থাকে—এটি নিজের অনুভূতির কথা। এখন এটিকেই মর্যাদা দিন। আগে এখানে কেবল জঙ্গল ছিল, এখন বাড়ি তৈরি হয়েছে এটি আপনাদের দেখা। এর কোন্‌টি চিরকাল থাকবে। একদিন সব শেষ হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না। তাহলে সবই শেষ হয়ে যাচ্ছে, প্রতিমুহূর্তে শেষ হচ্ছে। এগুলিকে বিনাশশীল বলেই যেন মেনে নেওয়া হয়।

জসু সত্যতা তে জড় মায়া। ভাস সত্য ইব মোহ সহায়া।।

মানস (১/১১৭/৪)

ছোট করে কত ভাল কথাই না বলা হয়েছে! যে সত্যতার দ্বারা এই জড় মায়াকে মূঢ়তার দরুণ সত্যের মতো দেখায় সেইটি হলো সত্য। যেমন ছোলার ছাতু দিয়ে বোঁদে তৈরি করলে স্বাদ পাওয়া যায় না, কিন্তু চিনির রসে ফেললে তা মিষ্টি হয়ে যায়। ছোলার ছাতুও যে মিষ্টি লাগে সেই মিষ্টতা তার নয়। ঐ মিষ্টি বোঁদে কিছুক্ষণ চুষতে থাকলে তা স্বাদহীন হয়ে

যাবে। কারণ তা তো স্বাদহীনই ছিল, তাহলে বলুন মিষ্টতা চিনির, না বোঁদের? যে স্বাদহীনকে মিষ্ট করে দেয় সে স্বয়ং মিষ্ট। এইরকম, যে অসত্যকে সত্যের মতো দেখায়, সেইটিই সত্য।

যার দ্বারা আলো এবং অন্ধকারের জ্ঞান হয়, সেটি হলো অলুপ্ত প্রকাশ অর্থাৎ সেই আলো কখনও লুপ্ত হয় না। সে ক্রিয়া এবং কর্মহীনতাকে, জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তিকে, সকল অবস্থাকে আলোকিত করে, তার দ্বারাই সব অবস্থাকে জানা যায়। আপনারা তাতেই সবসময় স্থিত থাকুন, তা থেকে নিচে নামবেন না।

(১৮) অবগুণ দূর করার উপায়

নিজের দোষগুলির প্রতি দৃষ্টি যাওয়াটা খুবই বড় কথা। এগুলিকে যত স্পষ্ট দেখা যাবে অবগুণগুলির সঙ্গে ততই সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হবে—এটি এক বড় তত্ত্বের কথা।

যখন সাধক নিজের মধ্যে দোষ দেখেন তখন তিনি ঘাবড়ে যান এবং এই কথা ভেবে দুঃখিত হন যে আমাকে তো সাধক বলা হয় আর আমার এই দশা! এইভাবে দুঃখিত হওয়া ভালই। কিন্তু আমার মধ্যে এই দোষ আছে, এটি মেনে নেওয়া ভাল নয়। মন দিন, সাধকের কাছে এইটি খুবই ভাল কথা। যেমন চোখের কাজলকে চোখ দেখতে পায় না, অন্য সবকিছু চোখ দেখতে পায়, তেমনই যতক্ষণ অবগুণ ভিতরে থাকে ততক্ষণ তাকে স্পষ্ট দেখা যায় না আর যখন অবগুণগুলিকে দেখা যায় তখন বুঝতে হবে যে এখন অবগুণ- গুলি আমার থেকে দূরে রয়েছে। যদি দূরে না থাকত তাহলে কি করে দেখতে পাওয়া যেত? যতটা স্পষ্ট এবং পরিষ্কার দেখা যাবে ততটাই সেগুলি দূরে সরে যেতে থাকবে। অত্যন্ত দূরবর্তী জিনিস এবং অত্যন্ত কাছের জিনিস—দুটিকেই চোখে দেখা যায় না। তাই অবগুণগুলিকে দেখতে পেলে এক ধরনের প্রসন্নতা আসা উচিত। আর তা

এই ভেবে যে এখন আর দোষগুলি আমার মধ্যে নেই এখন তা চলে যাচ্ছেই। অপসারিত হচ্ছে। তখনই ভুল হয় যখন সাধক সেগুলিকে নিজের মধ্যে বলে মেনে নেন।

নিজের মধ্যে দোষকে মেনে নেওয়া খুবই ভুল। নিজের মধ্যে মানলে দোষ সত্তা পেয়ে যায়। কিন্তু দোষের তো কোনও স্বতন্ত্র সত্তাই নেই! দোষকে নিজের মধ্যে মেনে নিলে সেই সত্তা দোষ পেতে থাকে। তার ফলে সেই দোষ বেঁচে থাকে, সে মারা যায় না। কেননা তা আপনার কাছ থেকে শক্তি লাভ করে।

দোষ নিজের মধ্যে নেই। এর একটি প্রমাণ হলো এই যে তাকে দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয় প্রমাণ হলো ; দোষ যদি নিজের মধ্যেই হয়ে থাকে তাহলে তা সবসময় দৃষ্ট হওয়া উচিত। 'আমি আছি' এই জ্ঞান যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার সঙ্গেই দোষও যে রয়েছে এই জ্ঞানও কি থাকে? এ চিরকাল থাকে না। সে আসে এবং যায়। তাহলে এইরকম আগন্তুক দোষ নিজের মধ্যে কি করে থাকতে পারে? আমি আপনাদের এই কথা বারবার বলে থাকি যে নিজের মধ্যে দোষকে মেনে নেওয়া খুবই ভুল। এত বড় ভুল যেন দোষকে আমন্ত্রণ করে এখান থেকে কোথাও চলে যেতে বারণ করার মতই। এইভাবে আপনারা দোষকে সাগ্রহে আমন্ত্রণ দিয়ে থাকেন।

মূল কথা, দোষ নিজেদের মধ্যে নেই। কেননা—

ঈশ্বর অংস জীব অবিনাসী। চেতন অমল সহজ সুখরাসী।।

(রামচরিতমানস, ৭/১১৭/১)

স্বয়ং হলো ঈশ্বরের অংশ, চিরকালীন, চেতন এবং জ্ঞানস্বরূপ। এটি অমল অর্থাৎ এতে মল নেই এবং এটি সহজ সুখরাশি। মানুষ সহজ স্বাভাবিকভাবে সুখরাশি হয়েও যখন অন্যের কাছ থেকে (সংশ্রবজনিত) সুখ চায় তখন সে ভুল করে। যখন অন্যের দিক থেকে সরে গিয়ে বৃত্তি নিজের স্বরূপের মধ্যে স্থিত হয় তখন সে সহজ সুখ অনুভব করে।

না সুখ কাজী পণ্ডিতাঁ না সুখ ভূপ ভয়াঁ।
সুখ সহজাঁ হী আবসী তৃষ্ণা রোগ গয়াঁ।।

অপরের কাছ থেকেই সুখ লাভের ইচ্ছা, লোলুপতা দূর হয়ে গেলে সহজ সুখ প্রকট হবে আর সহজ সুখের দ্বারা মন স্থির হবে। তুলসীদাস গোস্বামী বলেন—

নিজ সুখ বিনু মন হোই কি থীরা।

(রামচরিতমানস ৭/১০/৪)

যতক্ষণ পর্যন্ত নিজসুখ পাওয়া না যায় ততক্ষণ মন স্থির হবে না। যখন নিজ-সুখ পাওয়া যাবে—নিজের কাছ থেকেই সুখ লাভ হয়ে যাবে তখন আর মন কোথাও যাবে না। ইন্দ্রিয়গুলিও নিজে থেকে বশীভূত হয়ে যাবে, স্থির হয়ে যাবে।

এই দোষগুলি তিনটি কারণে পুষ্ট হয়—এক, নিজের মধ্যে দোষকে মেনে নিলে; দুই, অন্যের দোষ দেখলে এবং তিন, অন্যের দুঃখের পরোয়া না করলে। মনে রাখবেন, অন্যের দুঃখকে পরোয়া না করলে নিজের মধ্যে দোষ স্থিত হয়ে যায়, পাকা হয়ে যায়। সবসময় মনে রাখবেন যে আপনার দ্বারা যেন কারও দুঃখ না হয়। আপনার চলা, বলায়, বসায় কারও দুঃখ অথবা ক্ষোভ যেন না হয়। আমি কোনও একটি কাজ করছি, তার দ্বারা অন্যের দুঃখ তো হচ্ছে না? গীতায় ভগবান বলেছেন—

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ।। (৫/২৫)

সকল প্রাণীর হিতসাধনে রত পুরুষ নির্বাণ ব্রহ্মকে লাভ করেন।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতে রতাঃ।। (গীতা ১২/৪)

সকল প্রাণীর হিতকর্মে রত পুরুষেরা আমাকেই লাভ করেন। সেজন্য সাধক নির্গুণ তত্ত্বের প্রাপ্তিই চান অথবা সগুণ তত্ত্বের প্রাপ্তিই চান তাঁর মধ্যে কাউকে দুঃখ না দেবার ভাব থাকা একান্ত আবশ্যক। যিনি অন্যকে দুঃখ-কষ্ট দেন তিনি তত্ত্বে স্থিত হতে পারেন না। যে সিদ্ধান্ত সাধু সন্তেরা দিয়েছেন, গীতা দিয়েছেন, ভগবান দিয়েছেন তার বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত নয়। তার জন্য যদি মৃত্যু হয় তাও ভাল। অন্যথায় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলে ভয়ঙ্কর অপরাধ হয়।

'পরমার্থ-পত্রাবলী' পুস্তকে একদিন আমি একটি পত্র দেখেছিলাম। সেই চিঠিটি খুবই সুন্দর। সেই চিঠিটি হনুমানপ্রসাদ পোদ্দারকে গীতাপ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ব্রহ্মলীন জয়দয়াল গোয়েন্দকা মহাশয় লিখেছিলেন। খুবই পুরাতন চিঠি। তাতে লেখা আছে, স্বর্ণকারের কাছে সোনা গলাবার জন্য একটি বিশেষ ধরনের পাত্র থাকে। তাতে সোনাকে গলিয়ে গরম করলে সোনার মধ্যে যে ময়লা থাকে তা তাড়াতাড়ি জ্বলে যায়। কিন্তু, সোনায় যে বিজাতীয় ধাতু থাকে তা সহজে জ্বলে না। সেইরকমই অন্তঃকরণে যেসব আবর্জনা বা ময়লা থাকে সেগুলি জ্বলে গেলেও যে বিজাতীয় ধাতু থাকে—যেমন অপরকে দুঃখ দেওয়া, অপরের দোষ দেখা, সাধু-মহাত্মাদের বিরোধিতা করা প্রভৃতি দোষগুলি দূর হওয়া কঠিন। সাধনারূপ আগুন এবং সৎসঙ্গরূপ ফুৎকার যদি সবসময় চলতে থাকে তাহলে সেগুলি পুড়ে শেষ হয়ে যাবে, স্বচ্ছ হয়ে যাবে। আপনার স্বরূপ তো স্বচ্ছ, শুদ্ধই আছে।

যারা অপরের অহিত করে তাদের খুবই ক্ষতি হয়। যাঁরা অপরের হিত- সাধন করেন গীতা তাঁদের 'পরম যোগী' বলেছেন—

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।।

(৬/৩২)

তাৎপর্য হলো এই, কেউ যদি আমাদের জিনিস নিয়ে চলে যায় আমাদের খারাপ লাগে; আমাদের যদি দোষ দেখে তাহলে আমাদের খারাপ লাগে, আমাদের নিন্দা করলে আমাদের খারাপ লাগে, তিরস্কৃত করলে খারাপ লাগে, আমাদের মনের (ইচ্ছার) বিরুদ্ধে কিছু করলে খারাপ লাগে। সেই- রকম 'আত্মৌপম্যেন' নিজের শরীরের উপমা দিয়ে চিন্তা করুন যে অন্যের আমার প্রতি এই আচরণ যখন খারাপ লাগে তখন অন্যের প্রতি এই আচরণ আমি করব না। ভোগীরা এর অর্থ এইরকম করেন—যাতে নিজের সুখ হয় সেই কাজ করতে হবে আর যে কাজে নিজের দুঃখ হয়, সেই কাজ করা হবে না। খারাপ কাজ যারা করে তাদের

মেরে ফেলতে হবে, দূর করে দিতে হবে। কিন্তু যিনি সাধক তাঁর মধ্যে এই সাবধানতা থাকবে যে, এই সমস্ত আচরণ আমার খারাপ লাগে, তার অর্থ হলো আমি এইরকম আচরণ কারও সঙ্গে করব না। আমার যে দুঃখ তা আমার উন্নতির জন্য, অপরের আচরণ আমাকে যখন কষ্ট দেয় তখন আমার অনুরূপ আচরণ অন্যকেও কষ্ট দেয়! এটি খাঁটি কথা। শরীরের কোনও কষ্ট যেমন আমাদের ভাল লাগে না, তেমনই অপরের দুঃখও যেন আমাদের ভাল না লাগে। যদি আমাদের শরীর, মন, বাণী, ভাবনা প্রভৃতির দ্বারা কোনও প্রাণীর দুঃখ হয় তাহলে সাধনার সিদ্ধি তাড়াতাড়ি হবে না। নিজেদের শরীরের সুখ যেমন আমাদের ভাল লাগে সেইরকম অন্যের সুখ হলেও আমাদের ভাল লাগা উচিত।

মানুষের মধ্যে একটি বড় দুর্বলতা হলো এই যে তারা ভজন, ধ্যান প্রভৃতিকে সাধনা বলে মেনে নেয় কিন্তু অপরের দুঃখের পরোয়া করে না। এমন অবস্থা যদি থাকে তাহলে বহু বছর ধরে সৎসঙ্গ, সাধনা করলেও পরিবর্তন হবে না। এইজন্য অন্তত অন্যকে দুঃখ দেবেন না। যদি সেবা করেন তো ভাল কথা, যদি না করেন তাহলেও ততো ক্ষতি নেই, কিন্তু অন্যকে দুঃখ দিলে খুবই ক্ষতি হয়। এ থেকে সাধক যতটা বাঁচবেন ততটাই তাঁর নিজের সুখের কামনা দূর হবে। নিজের সুখভোগের বৃত্তি তখনই দূর হবে যখন অন্যের দুঃখ নিজেকে বিদ্ধ করতে থাকবে, অন্যের দুঃখ দূর করায় আমাদের সুখ হবে আর অন্যের দুঃখ আমাদের কাছেও দুঃখজনক হবে। নিজেদের দুঃখ দূর করবার জন্য মানুষেরা যেমন স্বতঃ প্রবৃত্ত হয় তেমনই অপরের দুঃখ মোচনেও যদি মানুষ স্বতঃ প্রবৃত্ত হয় তাহলে বিষয়েন্দ্রিয়ের সহযোগে সুখভোগের রুচি অপসারিত হবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যের দুঃখকে পরোয়া না করে কেবল নিজেদের সুখ নিতে থাকে ততক্ষণ নিজেদের সুখের প্রতি রুচি দূর হয় না। কেউ বলতে পারেন যে আমরা দুঃখ দিই না, তাহলে অন্যের দুঃখে চিন্তা করব কেন? এটির প্রয়োজন এইজন্য যে নিজেদের মধ্যে যে সুখ-বুদ্ধি রয়েছে, তাকে দূর করবার জন্য 'অপরের দুঃখ কি করে দূর হবে' এই চিন্তার প্রয়োজন

রয়েছে। তাহলেই নিজেদের সুখভোগের রুচি দূর হয়ে যাবে। এইজন্য সাধুদের লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

পর দুখ দুখ সুখ সুখ দেখে পর।। (রামচরিতমানস ৭/৩৮/১)

সুখভোগে দুটি জিনিস আছে। এগুলিকে সাধুরা কোথাও কণক ও কামিনী নামে এবং কোথাও অর্থ এবং নারী নামে উল্লেখ করেছেন। টাকা-পয়সার আসক্তি-হলো অর্থের আর নারীর প্রতি আসক্তি হলো কামিনী। এই দুটিই খুব খারাপ। তাই বলেছেন—

মাধোজী সে মিলনা কৈসা হোয়।
সবল বৈরী বসৈ ঘট ভীতর, কণক কামিনী দোয়।।

গীতা এই দুটিকে ভোগ এবং ঐশ্বর্য নামে উল্লেখ করেছেন—

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।।

(২/৪৪)

ভোগ শব্দে নারী এবং ঐশ্বর্য শব্দে অর্থ সংগ্রহকে বুঝতে হবে। যার এই দুটির প্রতি আসক্তি থাকে তার পরমাত্মাকে লাভ করতে হবে এই একনিষ্ঠ বুদ্ধি হয় না। এই আসক্তি তখনই দূর হয় যখন অপরের হিতসাধনের ভাব এসে যায়। আজকাল আমাদের দেশে এটির খুবই প্রয়োজন। যেমন, বিকানীরে যদি কখনও তরমুজ উৎপন্ন না হয় অথবা কম উৎপন্ন হয়, তাহলে অনেকেরই মনে হয়, যে এবার তরমুজ হয়নি, কেননা সেটি এখানে হয়ে থাকে। যেখানে তরমুজ উৎপন্ন হয়ই না সেখানে একথা মনে আসে না। তেমনই আমাদের দেশে সাধুদের মধ্যে এবং গৃহস্থদের মধ্যেও অনেক পরোপকারী মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। আজ তাঁদের সংখ্যা খুবই কমে যাওয়ায় দেশে উপকার করার মানুষদের অভাব রয়েছে।

আমাদের জন্য যেন কারও দুঃখ না হয়—এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ থাকলে নিজের জন্য সুখ ভোগের রুচি দূর হয়ে যাবে। আমাদের দৃষ্টি থাকে বৃত্তির দিকে, তার কারণের দিকে থাকে না। যদি কারণের অনুসন্ধান করে তাকে অপসারণ করেন তাহলে সব দোষ দূর হয়ে যাবে।

❀ ❀ ❀

(১৯) বাস্তবিক উন্নতি কিসে?

মানুষেরা চায় যে বস্তু তার কাছে নেই তা যেন সে এখনই পেয়ে যায়। তা পাওয়াতেই মানুষ নিজের উন্নতি বলে মনে করে। এক, ভোগ নেই, তা যেন পেয়ে যাই এবং দুই, টাকা-পয়সা নেই তা যেন পেয়ে যাই। এইভাবে যে জিনিস নেই তা পেয়ে গেলেই যেন আনন্দ! কিন্তু যা এখন নেই তা যদি পেয়েও যাই, তাহলেও তা যে পরে থাকবে না—এটিও খাঁটি কথা। টাকা-পয়সা যতই পাওয়া যাক না কেন তা চিরকাল সঙ্গে থাকবে না। হয় টাকা- পয়সাই চলে যাবে, আর নয়তো আপনারাই চলে যাবেন, কিংবা দুটিই চলে যাবে। যা আগে ছিল না তা পরেও থাকবে না। মানুষ এইরকম জিনিস বাসনা করে আর তা সংগ্রহ করে মনে করে যে খুব বেশি উন্নতি করে ফেলেছি, আমার মা-বাবা সাধারণ মানুষ ছিলেন, কিন্তু আমি লাখপতি, কোটিপতি হয়ে গিয়েছি—এ এক বড় কাজ করে ফেলেছি, আর তার জন্য অহঙ্কার করি। বাস্তবে দেখলে বোঝা যাবে যে এ এক বিরাট মূর্খতা, মামুলি মূর্খতা নয়।

সম্বন্ধ-জনিত যত সুখ আছে সেগুলি সবই দুঃখের কারণ—'**যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।**' (গীতা ৫/২২)। আর কেউই দুঃখের কারণ নয়। অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, প্রভু! মানুষকে পাপে কে ঠেলে দেয়? উত্তরে ভগবান বলেছিলেন '**কাম এব**' (গীতা ৩/৩৭) অর্থাৎ যা নিজের কাছে নেই তার কামনা। টাকা-পয়সা যেন পাই, মান-সম্মান যেন হয়, প্রশংসা যেন পাই, নীরোগ যেন হই, যেন আরাম লাভ করি প্রভৃতি কামনাগুলিই সকল পাপ ও দুঃখের মূল। যা উৎপন্ন হয় এবং নষ্ট হয়ে যায় সেইরকম বস্তুর জন্য কামনা থাকলে দুঃখ ভোগ করতেই হবে। এ থেকে ব্রহ্মাও বাঁচাতে পারবেন না। সম্বন্ধজনিত সুখের ইচ্ছা থেকে নির্ভেজাল দুঃখ ও পাপই হয়ে থাকে। সম্বন্ধ থাকার সময় কিছুটা সুখ পাওয়া যায়। কিন্তু আগে ও পরে কেবল দুঃখই থাকে। শরীর খারাপ হয়ে

যায়, তারপর নরকে যেতে হয়, চুরাশী লক্ষ যোনিতে যেতে হয়। এইভাবেই আগে এবং পরে কেবল দুঃখই হয়ে থাকে।

এই কথা আমি অনেকবার বলেছি যে, বস্তুর জন্য যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছাকে ত্যাগ করলেই সুখ লাভ হয়। কিন্তু লোকেরা মনে করে যে বস্তুর প্রাপ্তি হলেই সুখ হয়। বস্তু লাভ হলেই যদি সুখ হয় তাহলে সেই বস্তু থাকলে আর কোনও দুঃখ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু বাস্তবে দুঃখ বস্তু না পাওয়ার জন্য নয়, দুঃখ হলো তার জন্য ইচ্ছার, সেই ইচ্ছা চলে গেলেই সুখ হয়। সেই ইচ্ছা যদি চিরকালের জন্য চলে যায় তাহলেই আনন্দ।

যা নেই তার প্রাপ্তিতে বীরত্ব মনে করা বিরাট ভুল। যে পরমাত্মা চিরকাল ধরে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন তাঁকে লাভ করা বাস্তবে এক উন্নতি। সৃষ্ট হয় এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয় এইরকম বস্তুর প্রতি লোলুপতার জন্যই সেই নিত্যপ্রাপ্ত তত্ত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে না। যদি বিনাশশীল বস্তুর সম্বন্ধ ত্যাগ করেন তাহলে তা সহজেই পেয়ে যাবেন। তা তো প্রাপ্ত হয়েই আছে, কেবল সেদিকে দৃষ্টি নেই। দৃষ্টি রয়েছে কেবল বিনাশশীল ভোগ এবং সংগ্রহের দিকে, যা নেই এবং থাকবে না। পরমাত্মা ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। আর একবার পেয়ে গেলে কখনও ছেড়ে যাবেন না। তাঁকে পেলে, বিন্দুমাত্র মোহ, দুঃখ থাকবে না—**'যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহম্'** (গীতা ৪/৩৫)। তিনি আমাদের এবং মায়ের উপর শিশুর যে অধিকার তাঁর উপরও আমাদের তেমনই অধিকার। শিশু কেঁদে মাকে দিয়ে যা কিছু করিয়ে নিতে পারে, তেমনই ভগবানকে দিয়েও যা কিছু করিয়ে নিন। ভগবান বলেন—**'মৈ তো হুঁ ভগতানকো দাস ভগত মেরে মুকুটমণি'**। অর্থ কি কখনও বলেছে যে তুমি আমার মুকুটমণি? সে কি কখনও বলেছে যে আমি তোমার, তুমি আমার?' কিন্তু ভগবান বলেন যে তুমি আমার—**'মমৈবাংশঃ'** (গীতা ১৫/৭)। তিনি আমাদের এবং সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকেন। তাঁর সঙ্গে কখনও বিচ্ছেদ হয়নি, এখনও বিচ্ছেদ নেই আর হবেও না। এইরকম পরমাত্মার প্রতি বিমুখ হয়ে তাকেই চাইছেন যা এখন নেই আর পাওয়া গেলেও যা শেষ পর্যন্ত থাকবে না। বুদ্ধিতে কি

জল ঢেলে দিয়েছেন যে একেবারে বিপরীত পথেই চলছেন? বিনাশশীলের প্রতি ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হয় না। পূর্ণ হবেই বা কি করে? তা অপূর্ণ এবং আপনি পূর্ণ, তা থাকার নয় আর আপনারা যা চিরকাল থাকে সেই পরমাত্মার অংশ। অর্থের জন্য আপনারা ধর্ম ছেড়ে দেন, আরাম ছেড়ে দেন, সুখ ত্যাগ করেন ; সবকিছু ছেড়ে দিয়ে অর্থের পিছনে দৌড়ান। কিন্তু যখন সেই অর্থ চলে যেতে থাকে তখন আপনার দিকে একবার তাকিয়েও দেখে না। সেই নিষ্ঠুরের মনে এই দয়াও উৎপন্ন হয় না যে আমার জন্য এই লোকটি ধর্ম-কর্ম ছেড়েছে, সত্য কথা বলা ছেড়েছে, মিথ্যা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি বড় বড় পাপ স্বীকার করেছে। অন্তত একবার এর সম্মতি তো নেই! কিন্তু ভগবানের জন্য যদি ত্যাগ করেন তাহলে?

যে দারাগারপুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং বাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে।।

(শ্রীমদ্‌ভাগবৎ ৯/৪/৬৫)

ভগবান বলেন যে পুরুষ, স্ত্রী, পুত্র, বাড়ি, আত্মীয়স্বজন, অর্থ এবং এই পৃথিবীর লৌকিক সুখ ত্যাগ করে আমার শরণাগত হয়েছে, তাকে ত্যাগ করবার কথা আমার মনে কি করে আসতে পারে? এই ত্যাজ্য জিনিসগুলিকে ছেড়ে দিন, তাহলে ভগবান প্রসন্ন হয়ে যাবেন এবং আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে যাবেন। এই বস্তুগুলিকে কি কেউ নিজের কাছে রাখতে পারে? যা ছেড়ে যাবেই তাকে ছেড়ে দিলেই ভগবান প্রসন্ন হয়ে যাবেন। এত সস্তা কোনও সওদা কি আছে?

যতই অর্থ উপার্জন করুন, যতই ভোগ করুন, যেমন শরীরই লাভ করুন—সবকিছুই ছেড়ে চলে যাবে। এতে কি কোনও সন্দেহ আছে? তা সত্ত্বেও এর পিছনে ছোটেন এবং এগুলি পেলে খুব সুখী হন—এ কত বড় মূর্খতা!

আমরা নিজেরাই পরমাত্মার প্রতি বিমুখ। এজন্য তাঁকে আমরা পাই না।

সনমুখ হোই জীব মোহি জবহীঁ। জন্ম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহীঁ।।

(রামচরিতমানস ৫/৪৪/১)

আপনারা কেবল ভগবানকেই নিজেদের বলে মেনে নিন—ভগবানই হলেন আমাদের, এইসব বস্তু আমাদের নয়। এইটুকুই মাত্র কথা। শক্ত মোটেই নয়, যতক্ষণ না আপনারা পাকাপাকি ঠিক করছেন ততক্ষণই তা কঠিন। পাকা সিদ্ধান্ত করে নিলে তা আর কঠিন নয়। মনে মনে এটি ঠিক করে নিন যে দুঃখ, সন্তাপ, জ্বালা, অপমান, নিন্দা, রোগ, মৃত্যু যা কিছুই হোক; আমরা ভগবানের দিকেই যাব। তাহলে আমাদের কেউই আটকাতে পারবে না।

সব নরক এবং চুরাশি লক্ষ যোনি ভোগ এবং সংগ্রহের ইচ্ছার উপরেই অবলম্বিত। সকল দুঃখ, সন্তাপ, পাপ প্রভৃতি এ থেকেই হয়। তাহলে এগুলিকে পাওয়ায় বীরত্ব, উন্নতি মনে করা কত বড় ভুল। আপনারা ভাবেন, এত বেশি অর্থ যখন লাভ হলো তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা সফল। কিন্তু এ সফলতা নয়, এ হলো বিরাট ব্যর্থতা, এক মুহূর্তেই সব চলে যাবে। যাঁরা লাখপতি এবং কোটিপতি তাঁরা সুখী নন। আর যাঁরা ভগবানে নিমগ্ন তাঁরা সুখী, তাঁরা আনন্দে মশগুল।

ভোগ এবং ঐশ্বর্যের ত্যাগ যত হবে ততই শান্তি পাওয়া যাবে। একটি শ্লোকের ভাবার্থ হলো আশারূপী রজ্জুতে বন্ধ মানুষ তো ছুটতে থাকে কিন্তু মুক্ত মানুষ আনন্দে স্থির থাকে। **'আশয়া যে কৃত্তা দাসাস্তে দাসাঃ মর্বদেহিনাম্।'** যারা আশার দাস অর্থাৎ টাকা-পয়সা হোক, মান-সম্মান হোক, অমুক বস্তু পাই—এইরকম যাদের আশা তারা সম্পূর্ণরূপে শরীরধারীদের দাস এবং **'আশা যেন কৃতা দাসী তস্য দাসায়তে জগৎ'**—যারা আশাকে দাসী করে নিয়েছে সকলেই তাদের দাস হয়ে যায়। মানুষ যদি কেবল আশার দাস হয় তাহলে সমগ্র দুনিয়া তার উপর চেপে বসে যাবে। সে যদি গাছের কাছেও যায় তা হলেও তার 'এটা নিই, ওটা নিই' এইরকমই ভাবনা থাকবে। মানুষ হয়েও তার বুদ্ধি গেল কোথায়? কবে বুদ্ধি হবে? এই শরীর, ইন্দ্রিয়, ভোগ, যৌবন প্রভৃতি কত দিন থাকবে? তবুও আপনারা দিন-রাত না-থাকা জিনিসের আশায় লেগে থাকেন এবং নিত্যপ্রাপ্ত পরমাত্মার দিকে মন দেন না!

পরমাত্মা নিত্যপ্রাপ্ত এবং সংসার অপ্রাপ্ত। নিত্যপ্রাপ্তকে পাওয়া যদি কঠিন হয় তাহলে অপ্রাপ্তকে পাওয়া কি সুগম? পরমাত্মা কখনও অপ্রাপ্ত হন না। আমরাই তাঁর প্রতি বিমুখ, তিনি বিমুখ নন। পরমাত্মার প্রতি বিমুখ হওয়ায় তাঁকে দূরের বলে মনে হয় আর সংসারের কাছাকাছি থাকায় তাকে নিকটের বলে মনে হয়। বাস্তবে সংসার কখনও কাছে আসেনি এবং ভগবানও কখনও দূরে চলে যাননি। ভগবানের দূরে চলে যাবার ক্ষমতা নেই আর সংসারের আমাদের কাছে আসার বা টিকে থাকার ক্ষমতা নেই! কতই না বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কথা! ভগবানের দিকে অগ্রসর হলেই ভগবান প্রসন্ন হয়ে যান, খুশী হয়ে যান। যেমন শিশু মা-মা করতে করতে যখন কোলে এসে যায় তখন মা খুশী হন। মা শিশুকে লালন-পালন করেন, তার কাপড় তৈরি করেন। সব-কিছুই তিনি করেন এবং শিশু কোলে নিয়ে খুশী হন। এতে শিশুকে এমন কি খরচ করতে হলো? এইভাবেই আমরা যখন ঈশ্বর-মুখী হই, তিনিও খুশী হন—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সবং মম দেবদেব।।

(২০) কামনা-ত্যাগে শান্তি

ভগবৎ প্রাপ্তির পথে সংসারের ভোগ এবং সংগ্রহ হলো প্রধান বাধা। অর্থ সংগ্রহকে এত বেশি সম্মান দেওয়া হয়েছে যে যদি জীবন ভ্রষ্ট হয়ে যায়, নরকে যেতে হয়, চুরাশি লক্ষ যোনিতে যেতে হয় ; অপমান, নিন্দা, অসম্মান সইতে হয়, তো সেও ভাল। এইসব সত্ত্বেও অর্থ সংগ্রহ করতে হবে এই মানসিকতা এক ব্যাধি। দ্বিতীয়ত, ভোগ সুখভোগ করা, এইসব হলো আপদ। এই কারণে মানুষ নিজের অনুভূতিকে সম্মান করে না। কেননা আপনারা সম্মানের স্থানে অর্থ এবং সুখভোগকে গ্রহণ করেছেন। এই অবস্থায় যতই কিছু শিখুন না কেন অনুভূতি হবে না, শিখে নিয়ে

আপনি বড় পণ্ডিত হতে পারেন, ভাল বক্তৃতা দিতে পারেন, লেখক হতে পারেন, ভাল ভাল বই লিখতে পারেন, কিন্তু যা পরম শান্তি তা পেতে পারেন না। তার অনুভূতিও পেতে পারেন না। শেখা আর অনুভব করা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। দুটির মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য। অনুভূতি তখনই হবে, যখন ভোগ এবং সংগ্রহের কামনা থাকবে না। এত টাকা হোক, আরও টাকা হোক—এইরকম আকাঙ্ক্ষা আপনারা করে থাকেন। কিন্তু একটি কানাকড়িও সঙ্গে যাবে না। সম্পূর্ণ খালি হাতে যেতে হবে। শরীরও ঐইখানেই পড়ে থাকবে। এটি আগেও নিজের ছিল না এবং পরেও নিজের থাকবে না। একেবারে স্পষ্ট কথা। কিন্তু শুনে বা বলে এই কথা বোঝা যায় না। যখন ব্যাকুলতা জাগ্রত হয়, অন্তরে ভোগ এবং সংগ্রহ থেকে নিবৃত্ত হয়ে জ্বালা সৃষ্টি হয় কেবল তখনই এই কথা বোঝা যায়। যতক্ষণ অর্থ এবং ভোগে সুখ পেতে থাকেন ততক্ষণ এই কথা বুদ্ধি গোচর হবে না।

গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ বর্ণনার আরম্ভে এবং শেষে সমস্ত কামনা ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। উপক্রমণিকায় ভগবান বলেছেন—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান পার্থ মনোগতান্।

(গীতা ২/৫৫)

আবার উপসংহারেও সেই কথাই বলা হয়েছে—

বিহায় কামাণ্যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।

(গীতা ২/৭১)

ভোগ এবং সংগ্রহের কামনাই হলো প্রধান বাধা। এই দুটি থাকলে শত শত, হাজার হাজার কামনা এসে যায়। এই কামনাগুলি মনের স্বরূপ নয়, এগুলি মনে এসে থাকে—'**মনোগতান্**'। এইসব কামনাকে ত্যাগ করে দিন। আজ যদি মৃত্যু হয় তাহলে, আবার বেঁচে উঠলে ভালই হয়, এমন কামনাও যেন জাগ্রত না হয়। শরীরকে খুবই ভাল লাগে, কিন্তু এও চলে যাবে, যা চলে যাবে তার প্রতি মায়া-মমতা প্রথম থেকেই ত্যাগ করুন। যদি প্রথমেই ত্যাগ না করেন তাহলে পরে খুবই দুর্দশা হবে। ভোগে, অর্থে, বস্তুতে আসক্তি থাকলে, তাতে মন নিযুক্ত হলে খুবই দুর্দশা হবে। সাপ,

অজগর হতে হবে; ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি না জানি কত কী হতে হবে।

এক সাধুর কথা আমি শুনেছি। তিনি ছিলেন বিরক্ত ত্যাগী সাধু। টাকা-পয়সা স্পর্শ করতেন না এবং একান্তে ভজনা করতেন। একজন তাঁর খুব সেবা যত্ন করতেন। প্রতিদিন তাঁর জন্য খাবার নিয়ে আসতেন, একদিন খুব দরকারি কাজে তাঁকে অন্য শহরে যেতে হয়েছিল। তিনি সাধুকে বলেছিলেন, মহারাজ! আমি তো চলে যাচ্ছি। তখন সাধু বলেছিলেন, ভাই, আমার সেবা তোমার অধীন নয়, তুমি যাও। তিনি বলেছিলেন মহারাজ, এর পরে যদি কেউ আপনার সেবা না করে তাহলে কী হবে? আমি কুড়িটা টাকা এখানে পুঁতে রাখছি। দরকার হলে আপনি কাউকে বলে দেবেন। বাবাজী না-না বলছিলেন, কিন্তু তিনি কুড়িটা টাকা পুঁতে দিয়েছিলেন। এবার তিনি তো চলে গেলেন। পরে বাবাজী অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন, মরে ভূত হলেন। তখন রাত্রিতে সেখানে কেউ থাকলে খড়মের খট্ খট্ শব্দ শুনতে পেতেন। লোকেরা ভাবলেন, ব্যাপার কী? যখন সেই ভদ্রলোক আবার এলেন তখন তাঁকে বলা হলো যে ওখানে রাত্রিতে খড়মের আওয়াজ শোনা যায়। কোনও ভূত-প্রেত হবে, কিন্তু কারও ক্ষতি করে না। তিনি সেখানে রাত্রিতে থাকলেন। তাঁর খুব দুঃখ হলো। তিনি প্রার্থনা করায় বাবাজী দেখা দিলেন এবং বললেন, মৃত্যুর সময়ে তোমার রাখা টাকার দিকে আমার মন চলে গিয়েছিল। এখন তুমি যদি এই টাকাগুলি কোনও সৎ-কর্মে ব্যয় কর তাহলে আমার মুক্তি হয়। বাবাজী তো টাকা খরচ করেননি। কিন্তু 'আমার জন্য টাকা রয়েছে' এই চিন্তার ফলে তাঁর অমন দশা হয়েছিল। তারপর সেই টাকা সেখান থেকে বার করে ধর্মের কাজে খরচ করা হয়েছিল, তখন বাবাজীর সেই যোনী থেকে মুক্তি হয়েছিল।

বৃন্দাবনের একটি ঘটনার কথা আমি শুনেছিলাম। একজন ভিক্ষুক একটি গলির ভিতর ভিক্ষা করত। তার কাছে এক টাকার কিছু কম পয়সা যোগাড় হয়েছিল। সে মারা গেল। যেখানে তার ছেঁড়া ঝোলা পড়েছিল সেখানে লোকেরা একটি সাপকে বসে থাকতে দেখেছিল। সাপটিকে

কয়েকবারই দূরে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু সে বারবার সেখানে এসে বসছিল। যখন সে সেখান থেকে চলে গেল না তখন লোকেরা ভাবতে লাগল, ব্যাপার কী? সাপকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তারা ঝোলাটাতে দেখল যে তাতে কিছু পয়সা রয়েছে। লোকেরা পয়সাগুলি কোনও সৎ কাজে খরচ করে দিল, তারপর আর সাপটাকে দেখা গেল না।

এই যে অন্তরের বাসনা তা খুবই ভয়ঙ্কর। বাসনা তখনই থাকে যখন বস্তুর প্রতি প্রীতি থাকে। যেখানে বস্তুর প্রতি প্রীতি বা আকর্ষণ রয়েছে সেখানে ভগবানের প্রতি প্রীতি থাকা চাই। আপনি বাইরে থেকে যত ভাল ভাল কাজই করুন না কেন অন্তরে যদি সংসারের প্রতি প্রীতি বা আকর্ষণ থাকে তাহলে তা খুবই বিপজ্জনক। এইজন্য ভগবান সকল কামনা ত্যাগ করার কথা বলেছেন '**বিহায় কামান্যঃ সর্বান্পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।**'

নিঃস্পৃহের অর্থ হলো—নির্বাহ কেমন করে হবে, আমার জীবন কেমন করে চলবে—এই ধরনের কোনও ভাবনাকে মনে স্থান না দেওয়া। জীবন তো অতিবাহিত হবেই। যেসব কর্মের ফলে জীবন লাভ হয়েছে সেইসব কর্মের দ্বারাই নির্বাহও হবে। ভাগ্যে না থাকলে ধনী ব্যক্তিও বেশি ভোগ করতে পারে না, আর ভাগ্যে থাকলে সাধারণ মানুষও অনেক ভোগ্য বস্তু পেয়ে যাবে। যার পাবার নয়, সে পাবে না আর যার পাবার সে পেয়ে যাবে। মনের মধ্যে বস্তুর প্রতি যে প্রীতিভাব বাধা সেইটিই। তা না থাকলেও টাকা-পয়সা, বস্ত্র, সম্মান, মহিমা প্রভৃতি পেয়ে যাবেন। নির্বাহের জন্য ভাণ্ডার নিজে থেকেই পেয়ে যাবেন। আপনারা যে তার আশা করেন, সেইখানেই ভুল।

অন্তরে যে ভোগ এবং সংগ্রহের স্পৃহা, যার কারণে সেগুলি ভাল লাগে, সেগুলিকে ফেলে দিতে মন চায় না; সেই স্পৃহাকেই ত্যাগ করতে হবে। এরই নাম হলো ত্যাগ। বাইরের ত্যাগও ভাল, সহায়ক। কিন্তু বাস্তবে স্পৃহাকে ত্যাগ করাই হলো ত্যাগ। সেই স্পৃহাই জন্ম-মৃত্যুকে নিয়ে আসে, বড় বড় নরকে নিক্ষিপ্ত করে।

ভগবান চারটি জিনিস ত্যাগ করতে বলেছেন। সেগুলি হলো—যা প্রাপ্ত নয় তার কামনা, যা প্রাপ্ত তার প্রতি মমতা, নির্বাহের জন্য স্পৃহা

এবং 'আমি এমন' এই অহঙ্কার। এই অহঙ্কারের জন্যই নিজেকে অপরের তুলনায় আলাদা মনে করা হয়।

বিহায় কামান্যঃ সর্বানপুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।।

(গীতা ২/৭১)

যে মানুষ সকল কামনা ত্যাগ করে মমতারহিত, অহঙ্কাররহিত এবং স্পৃহারহিত হয়ে বিচরণ করে; সেই শান্তি পায়।

কামনা, স্পৃহা, মমতা এবং অহঙ্কার—এই চারটি সম্পূর্ণ ত্যাগ যদি এখন হয়ে যায় তাহলে এখনই শান্তি পাওয়া যাবে। এই চারটি ভীষণ অশান্তি সৃষ্টি করে। এগুলিকে ত্যাগ করতে চান না এবং শান্তি পেতে চান, এমন কখনও হতে পারে না।

কামনা ত্যাগের দ্বারাই কর্মযোগ সিদ্ধ হবে। কর্মযোগের দ্বারা সিদ্ধ পুরুষের নাম স্থিতপ্রজ্ঞ। তাঁর লক্ষণ জানাবার সময় প্রারম্ভে এবং অন্তিমে ত্যাগের কথাই বলা হয়েছে। কামনা, স্পৃহা, মমতা এবং অহঙ্কার—এইগুলির ত্যাগ হলে ব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়ে যাবে—**'ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি'** (গীতা ২/৭২)।

অন্তিমে বাসনা না জানি কোথায় থেকে যাবে? অন্য কোথাও স্থান না থাকলে শরীরে তো থাকতে পারে। তাই মানুষ যত সাবধান থাকবে ততই ভাল। শরীর তো মূল জিনিস; তাই এতে অহংতা-মমতা থাকা উচিত নয়। এতে অহংতা-মমতা থাকলেই এর নির্বাহের ইচ্ছা হয়। কিন্তু ইচ্ছায় তো শরীর থাকবে না। বাঁচার ইচ্ছা করতে করতেই মানুষ মরে যায়। ইচ্ছা করলে কোনও কিছুই লাভ হয় না এবং কোনও লোকসানই বাকি থাকে না। এ বিষয়ে আমি যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করেছি।

প্রশ্ন—কামনা ত্যাগ করবার জন্য কী করব?

উত্তর—আপনাদের মনে যদি করবার ইচ্ছা থাকে তাহলে এই কাজটি করুন—নামজপ করুন এবং অন্তরে প্রার্থনা করুন, হে নাথ! হে প্রভু! আমার কামনা, আসক্তি দূর কেন হচ্ছে না? মন দিয়ে এইভাবে অন্তরে

চীৎকার করতে থাকুন। সেই প্রভু পরমদয়ালু, তিনি কৃপা করবেন। এই কাজটি আপনারা করে দেখুন। অনেক রকম উপায় আছে, কিন্তু নিষ্ঠা প্রবল হওয়া উচিত।

(২১) আমি শরীর নই

নিজেকে শরীর মনে করলেই জন্ম-মৃত্যু, দুঃখ, সন্তাপ, চিন্তা প্রভৃতি সব আপদ এসে যায়। শরীর নিজের স্বরূপ নয়, এটি খুবই স্পষ্ট। ছোটবেলাতে যে শরীর ছিল এখন তা নেই। এখন এত পরিবর্তন হয়েছে যে চেনাই যায় না। কিন্তু 'আমি সেই আছি'—এতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। তাহলে অন্তত এইটি মনে করুন যে 'আমি শরীর নই।' আমি স্থূল-শরীর নই, সূক্ষ্ম-শরীর নই, কারণ-শরীরও নই। স্থূল-শরীরের স্থূল সংসারের সঙ্গে ঐক্য আছে— **ছিতি জল পাবক গগন সমীরা। পঞ্চ রচিত অতি অধম সরীরা।।**

(মানস ৪/১১/২)

এখন কোন শরীর কি আছে যা এই পাঁচটি থেকে রহিত? সংসারের সঙ্গে শরীরের সম্পূর্ণ অভিন্নতা রয়েছে। সংসারকে 'এই' বলা হয়। তাহলে সংসারের একটি ছোট্ট অংশ 'আমি' কি করে হবে? এইভাবে সূক্ষ্ম সংসারের সঙ্গে সূক্ষ্ম-শরীরের ঐক্য আছে। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি প্রাণ, মন, বুদ্ধি—এইগুলি সূক্ষ্ম সংসারের-ই অংশ। এই-যে বায়ু প্রবাহিত, এর সঙ্গে প্রাণের ঐক্য রয়েছে। এইভাবে সকল ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ প্রভৃতির মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান। সবগুলি একই ধাতু থেকে উৎপন্ন। এইভাবেই কারণ- শরীরের ঐক্য কারণ সংসারের সঙ্গে। সূক্ষ্ম-শরীরের পরে আর কোনও কিছুর জ্ঞান থাকে না। এইরকম যে অজ্ঞান সে হলো কারণ-শরীর। এতে প্রকৃতি (স্বভাব) থাকে। প্রকৃতি সকলের বিভিন্ন হলেও ধাতু (পঞ্চমহাভূত) এক। সেরকম প্রকৃতিও এক। সুষুপ্তির

সময় সব এক হয়ে যায়, কোনও ভিন্নতা থাকে না। এইভাবে সব কারণ-শরীরও এক। তাহলে এটি আমি আর ঐটি আমি নই, এটি আমার এবং ঐটা আমার নয়—এই কথা যথার্থ নয়। এটি ব্যবহারের জন্য কাজের কথা। নিজেকে শরীর মনে করা ভুল। এই ভুলকে যদি আমরা আজই মিটিয়ে দিই তাহলে খুবই শান্তি লাভ করব, খুবই আনন্দ লাভ করব। কিন্তু কেবল শুনে শিখে নিলে এই ভুল দূর হয় না। এই শরীরকে ইদংতার দ্বারা দেখা উচিত—**'ইদং শরীরম্'** (গীতা ১৩/১)। এই ছাদকে যেমন পৃথক দেখা যায় তেমনি শরীর সম্পর্কেও এই অনুভূতি হওয়া উচিত যে ঐটি পৃথক, আমি এটিকে জানি। এটিকে শিখতে হবে না। শেখা বা মানা জ্ঞান নয়। দৃঢ়ভাবে মেনে নেওয়াকেও জ্ঞানের মতো প্রতীত হয়। কিন্তু স্বীকৃতি কেবল স্বীকৃতিই, তা বোধ নয়। ঐ বিষয়ে পরিষ্কার বোধ হওয়া চাই। পরিবর্তনশীল বস্তু আমার স্বরূপ নয়—এই অনুভূতি জাগ্রত হলে তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যাবে, মুক্তি হয়ে যাবে, পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি হবে, স্বরূপকে পাওয়া যাবে। আর তা তো নিত্য প্রাপ্তিকেই পাওয়া; কেননা নিজের স্বরূপ কবে অপ্রাপ্ত হলো? আর যা প্রতিমুহূর্তে বদলে যায় তাকে কি কেউ কখনও পেয়েছে? সেটি কেউ কখনও পায়নি। প্রাপ্ত যা তা স্বরূপ। কিন্তু অপ্রাপ্তকে প্রাপ্ত মনে করলে যা প্রাপ্ত তা অপ্রাপ্তের মতোই হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত অপ্রাপ্তকে অপ্রাপ্ত মনে না করবেন ততক্ষণ প্রাপ্তের প্রাপ্তি অনুভূত হবে না।

শুনে শিখে নেওয়া এবং মেনে নেওয়া জ্ঞান নয়। জ্ঞান এমন জিনিস নয়। জ্ঞান তো একেবারে সেই মুহূর্তেই হয়ে যায়, তাতে অভ্যাস নেই। অভ্যাস করা হলো উপাসনা। উপাসনা তো উপাসনাই, বোধ নয়। শরীর আমি—এমনটি আভাস হলে যদি অন্তরে জ্বালা হয় তাহলেই বোধ হয়ে যাবে। যেমন, নিদ্রিত ব্যক্তিকে সূচ ফোটালে, বিরক্ত করলে তখনই ঘুম চলে যায়, তেমনই, নিজেকে শরীর মনে করলে যদি দুঃখ হয়, জ্বালা হয়, এমন যদি মনে হয় কী করি, কেমন করে করি, এই অভ্যাস কি করে দূর হবে তাহলেই তা দূর হয়ে যাবে। যে জিনিস শেষ হয়ে যায় তা চিরকাল থাকে না, আর যা চিরকাল থাকে তা শেষ হয় না **'নাসতো বিদ্যতে ভাবো**

নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।' (গীতা ২/১৬) শরীরে আমি-ভাব, আমার ভাব দূর হয়ে যায়। তার মানে মূলে তা নেই। এইটিই পাকা কথা।

সর্বপ্রথম সাধককে দৃঢ়তার সঙ্গে এই কথা মানতে হবে, 'আমিই হলাম শরীর আর এটি আমার' এটি একেবারেই মিথ্যা কথা। আমরা যদি বুঝতে না পারি, আমাদের যদি বোধ না হয় তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু শরীর 'আমি নই' আর 'আমার নয়, নয়, নয়'—এই ধারণা পাকা করা হোক, জোরের সঙ্গে। জোর করলে যখন অনুভূতি হবে না, তখন তার জন্য ব্যাকুলতা, অস্থিরতা সৃষ্টি হবে। তাতে তাড়াতাড়ি বোধ এসে যাবে।

'শরীর আমি নই'—এই কথাকে বুদ্ধি যদি স্বীকার নাও করে, আপনারা তাতে স্থিত হন। বুদ্ধির স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি কোনও বড় কথা নয়, এটি আমি নই, এইটিই আসল কথা। **'অহং ব্রহ্মাস্মি'** 'আমি ব্রহ্ম' এটি তত তাড়াতাড়ি লাভদায়ক নয় যতটা লাভদায়ক 'আমি এইটি নই'—এই বোধ। দুই ধরনেরই উপাসনা আছে। কিন্তু 'এইটি আমি নই'—এতে তৎক্ষণাৎ বোধ জাগ্রত হয়, কিন্তু প্রথমে খুব চিন্তা করে এটি তো স্থির করে নিন যে শরীর কখনও 'আমি' এবং 'আমার' হতে পারে না। এইরকম পাকা, জোরদার ধারণা করলে অনুভূতি না জাগলে দুঃখ হবে। সেই দুঃখের মধ্যে শরীর থেকে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছেদ করবার শক্তি আছে। সেই দুঃখ যত তীব্র হবে তত তাড়াতাড়ি কাজ সিদ্ধ হবে।

'আমি কী'? এমন চিন্তা করবেন না, তাতে মন-বুদ্ধি সঙ্গে থাকবে। জড়ের সহায়তা ছাড়া 'আমি কী?'—এইরকম প্রশ্ন উঠতে পারে না। আবার জড়কে সঙ্গে না নিলে সমাধানও করতে পারেন না। এইজন্য জড়ের সহায়তায় জড়ের নিবৃত্তি এবং চিন্ময়তার প্রাপ্তি হয় না, কখনই হয় না। 'আমি চিন্ময়'—এতে বুদ্ধির সহায়তা আছে আর তাতে অহং-ভাবও সঙ্গে থাকবে। কিন্তু 'আমি জড় নই, কখনই নই' এতে জড়তার উপর না-এর জোর পড়বে, চিন্তনও জড়তার এবং নিষেধও জড়তার। যেমন ঝাঁটা আর আবর্জনা এক ধাতুর, ঝাঁটা দিয়ে আবর্জনা পরিষ্কার করে ঝাঁটাকেও বাইরে ফেলে দিলে পরিষ্কার বাড়ি পিছনে থেকে যাবে, তার জন্য আলাদা উদ্যোগ নিতে হয় না, তেমনই জড়তার দ্বারা জড়তাকে নিবৃত্তি করলে ব্রহ্ম

থেকে যান। তাঁর (ব্রহ্মের) জন্য আলাদা উদ্যোগ নিতে হবে না। প্রকৃতির সহায়তা ছাড়া উদ্যোগ হয় না।

'আমি এই নই'—এতে 'আমি' এবং 'এই' এক জাতির। এই-যে 'আমি' —এটি দুদিকে যায়। একটি 'আমি' জড়তার দিকে যায় এবং অন্য 'আমি' চেতনার দিকে যায়। চেতনার দিকে 'আমি'-কে মানলে (অর্থাৎ আমি চিন্ময়) জড়তার 'আমি' দূর হবে না আর জড়তার 'আমি'-কে মানলে (অর্থাৎ আমি এটি নই) তা স্বতঃই দূর হয়ে যাবে। এইজন্য সাধকের পক্ষে 'আমি এই'—এর চেয়ে 'আমি এই নয়'—এটি বেশি উপযোগী। আমি দু'পক্ষের কথাই পড়েছি এবং সে সম্পর্কে গভীর চিন্তা করেছি। সেজন্য আমি আমার ধারণার কথা বলছি। আপনাদের যদি ভাল না লাগে তো আপনারা যেমন ইচ্ছা করবেন। কিন্তু নিষেধাত্মক সাধনায় স্বরূপে স্থিতি যত তাড়াতাড়ি হয় সদর্থক সাধনায় তত তাড়াতাড়ি হয় না। তেমনি দুর্গুণ-দুরাচার ত্যাগ করলে সংগুণ-সদাচার তাড়াতাড়ি এসে যাবে। যেমন 'আমি সত্য বলব' এর মধ্যে যতটা অহঙ্কার থাকবে 'আমি মিথ্যা বলব না' এতে ততটা অহঙ্কার থাকবে না। মিথ্যা না বলে কী আর এমন বড় কাজ করা হলো, আর সত্য কথা বলে খুব বড় কাজ করা হয়েছে এইরকম ভাব থাকবে। সেজন্য সত্য বলার অহঙ্কার তাড়াতাড়ি দূর হয় না।

বুদ্ধি সঙ্গে থাকলে জড়তার সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হতে পারে না; কেননা যার সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করতে হবে তাকেই (শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি) সঙ্গে নিয়েছেন। এইদিকে চিন্তা না করলে অনেক বছর লেগে যায়। সাধক চিন্তা করতে থাকেন, চিন্তা করতে থাকেন আর স্থিতি যেখানকার সেখানেই থেকে যায়। যেমন কলুর বলদ সারাজীবন ধরে চললেও যেখানকার সেখানেই থেকে যায়। এইজন্য এই বিষয়ে গভীর চিন্তা করা প্রয়োজন।

❁ ❁ ❁

॥ শ্রীহরি ॥

গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ প্রকাশিত বাংলা বই-এর সূচীপত্র

(১) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (তত্ত্ব-বিবেচনী) বৃহৎ আকারে
(২) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (সাধক-সঞ্জীবনী) বৃহৎ আকারে
(৩) গীতা-দর্পণ
(৪) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (পদচ্ছেদ, অন্বয়, অনুবাদ)
(৫) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (মূল শ্লোকসহ সরল অনুবাদ, বোর্ড বাইন্ডিং)
(৬) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (বোর্ড বাইন্ডিং)
(৭) গীতা-মাধুর্য
(৮) শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা (লঘু আকারে)
(৯) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (ক্ষুদ্রাকারে)
(১০) শ্রীরামচরিতমানস (রামায়ণ)
(১১) কল্যাণ প্রাপ্তির উপায়
(১২) ভগবৎপ্রাপ্তির পথ ও পাথেয়
(১৩) ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ?
(১৪) প্রশ্নোত্তর মণিমালা
(১৫) অমৃত-বিন্দু
(১৬) তত্ত্বজ্ঞান কি করে হবে ?
(১৭) কর্ম-রহস্য
(১৮) সাধনা
(১৯) মুক্তি কি গুরু ছাড়া হবে না ?
(২০) পরমার্থ পত্রাবলী
(২১) কল্যাণকারী প্রবচন
(২২) বিবেক চূড়ামণি (মূলসহ সরল টীকা)
(২৩) স্তোত্ররত্নাবলী (প্রাচীন বিভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্রের মূলসহ সরল অনুবাদ।)
(২৪) সহজ সাধনা
(২৫) আদর্শ নারী সুশীলা
(২৬) কর্তব্য সাধনায় ভগবৎপ্রাপ্তি
(২৭) তাত্ত্বিক-প্রবচন

(২৮) আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন
(২৯) সৎসঙ্গের কয়েকটি সার কথা
(৩০) পরমাত্মার স্বরূপ এবং প্রাপ্তি
(৩১) ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব
(৩২) সাধকদের প্রতি
(৩৩) আদর্শ গল্প সংকলন
(৩৪) শিক্ষামূলক কাহিনী
(৩৫) দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম
(৩৬) সাধন এবং সাধ্য
(৩৭) আত্মোন্নতি এবং সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রক্ষার্থে কয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য
(৩৮) ঈশ্বরকে মানব কেন ? নামজপের মহিমা এবং আহার শুদ্ধি
(৩৯) দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং গুরুতত্ত্ব
(৪০) মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া
(৪১) সন্তানের কর্তব্য
(৪২) মূর্তিপূজা
(৪৩) মাতৃশক্তির চরম অপমান
(৪৪) কল্যাণের তিনটি সহজ পন্থা
(৪৫) গর্ভপাত করানো কি উচিত —আপনিই ভেবে দেখুন
(৪৬) ওঁ নমঃ শিবায়
(৪৭) নবদুর্গা
(৪৮) কানাই
(৪৯) গোপাল
(৫০) মোহন
(৫১) শ্রীকৃষ্ণ
(৫২) দশাবতার
(৫৩) দশমহাবিদ্যা
(৫৪) মূলরামায়ণ ও রামরক্ষাস্তোত্র
(৫৫) ভক্তিসূত্র (নারদ ও শাণ্ডিল্য)
(৫৬) হনুমানচালীসা
(৫৭) আনন্দের তরঙ্গ
(৫৮) সুন্দরকাণ্ড (বঙ্গানুবাদ সহ)
(৫৯) শ্রীশ্রীচণ্ডী

সূচীপত্র